স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৭ম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-মে ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

বেয়াড়া ব্যাকটেরিয়া
ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

টিবি ব্যাকটিরিয়া বেজায় বেয়াড়া। এই জীবাণু, কেবলই নিজের ভোল পালটে ফেলে এমনভাবে যে ওষুধ অকেজো হয়ে যায়, হয় ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। তাতে অনেক ওষুধ তিনবছর অবধি দিতে হয়। সব মানুষ টিবি নিয়ে গোড়ার কথা না-জানলে এই অসুখ লোপ পাবে না। ৪

রোগটার নাম অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

সবচেয়ে বেশি যে ধরনের বাতরোগ দেখা যায় তা হল অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস। গাঁটে ব্যথা এবং গাঁট শক্ত হয়ে যাবার এই রোগের উপসর্গ, লক্ষণ ও চিকিৎসায় কাজ হওয়া-না-হওয়া নিয়ে জানুন। ৮

ব্যথার উপশম এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার
ডা. মৌসুমী দাস

মুমূর্ষু অনারোগ্য মানুষের শেষ দিনগুলির দেখভালের জন্য হাসপাতালের বদলে সেবা ও শান্তির আশ্রয় এবং রোগ সারানোর চিকিৎসার বৃথা-চেষ্টার বদলে রোগের কষ্ট কমানোর স্থান ও ব্যবস্থা দরকার। একে বলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার। এদেশে এখনও এই চিকিৎসার ব্যবস্থা কম, তবে দিন বদলাচ্ছে। ১১

ডিমেনশিয়া শুধুই স্মৃতিভ্রংশ নয়
ডা. অপূর্ব

ডিমেনশিয়ার বহু উপসর্গের একটি হল স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া। মূলত বয়স্ক মানুষের সমস্যা এ-রোগ। হাজার সমস্যা নিয়ে আসা এই রোগকে চিনতে হবে দ্রুত, কেননা ডিমেনশিয়ার স্থায়ী কোনো প্রতিকার বা চিকিৎসা খুঁজে পাওয়া যায়নি, চেষ্টা করলে কিছুদুর পর্যন্ত একে আটকানো সম্ভব। ১৫

স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৮
ডা. অপূর্ব

পয়লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাষ্ট্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে নতুন প্রকল্প এসেছে National Health Protection Scheme (NHPS)। তাতে দেশের দশ কোটি গরিব পরিবারের জন্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা। এই 'যুগান্তকারী' পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের আলোচনা। ৫১

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩

বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত ৪

রোগটার নাম অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৮

ব্যথার উপশম এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার ডা. মৌসুমী দাস ১১

ডিমেনশিয়া শুধুই স্মৃতিভ্রংশ নয় ডা. অপূর্ব ১৫

হাম ডা. জয়ন্ত দাস ১৯

অ্যাথেরোস্কেরোসিস বা ধমনিতে চড়া পড়া ডা. অনিন্দিতা দাস ২২

মন নিয়ে কথকতা ডা. স্বস্তিশোভন চৌধুরি ২৪

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও তার প্রশিক্ষণ স্বাতী মুখার্জ্জী ঘোষাল ২৯

হারিয়ে গেল খেলা রুমঝুম ভট্টাচার্য ৩১

স্বাস্থ্য, অসুখ, পরিষেবা ও ডাক্তারদের মুষ্টিযোগের কাহিনি ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৩৩

হরেকরকম

ভাইরাস সংক্রমণের পর কতদিন রোগীর সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত ৪০

মদ খেলে সেটা কতক্ষণ শরীরে থাকে ও নেশার অবস্থা বজায় রাখতে পারে ৪১

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন** ৪২

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩

দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা ধ্রুবজ্যোতি দে ৪৭

স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৮ ডা. অপূর্ব ৫১

বই পড়া

স্বাস্থ্য (অ) ব্যবস্থা ডা. বিষাণ বসু ৫৪

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-

এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭

আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto

A/c No. 0315101025024

Canara Bank, Princep Street Branch

IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

নীরব মোদী, ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও স্বাস্থ্য-বাজেট

নীরব মোদী, তাঁর প্রণম্য পূর্বসূরী ললিত মোদী ও ভিজয় মাল্য-র পদানুসরণ করে সরকারি ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দিব্যি আছেন। মোদীদের মাল্য-দান যজ্ঞের খরচাটা জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে দেওয়া হবে নাকি ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহকদের টাকা আটকে রেখে, সেটা ভেবেই আমাদের সরকার আকুল। ব্যাঙ্কের হিসেবখাতায় এইসব বাজে ঋণ কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে। যিনি 'দে মা আমায় তবিলদারী' বলে ভোট চেয়েছিলেন, তিনি বলছেন, আরে, আমি কী করব, আমার আমলে টাকা মার গেলে কী হয়, ধার দেওয়া শুরু করেছিল 'ওরা'। এইসব চাপান-উতোরের মধ্যে ভুলে সবাই যাচ্ছি যে মোদী-মাল্যর হাতে কিন্তু সরকারি ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের কম অংশই গেছে। এঁদের চেয়ে অনেক বড়ো ও নামকরা মালিক আছেন যাঁরা বহাল তবিয়তে তহবিল সাফাই করছেন ও করে চলেছেন।

কিন্তু স্বাস্থ্য-বাজেট নিয়ে কথা বলতে হঠাৎ ব্যাঙ্কের টাকা মারার কথা আসে কেন? আসে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং কমিশন ২০১০ সালে শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছিল, উদ্দেশ্য সবার জন্য চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। সেই বিশেষজ্ঞ দল রিপোর্ট দিয়েছিল, ২০১৭ সালের মধ্যে দেশের জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ সরকার খরচ করলেই সমস্ত দেশবাসীর নিখরচায় সমস্ত ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব, আর রোগ আটকানোর কাজও করা যায়। জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ মানে, নীরব মোদী একা যে টাকাটা মেরে দিয়েছেন, তার ২০ গুণ টাকা।

মোদী-মাল্যদের বড়ো দাদাস্থানীয় সত্যিকারের রাঘব-বোয়ালদের কীর্তি অনেক বেশি, এবং তাঁদের নাম একদিকে ব্যাঙ্কগুলো রাজনীতিবিদদের চাপে প্রকাশ করে না, অন্যদিকে এঁদের হাতে সমস্ত ধরণের মিডিয়ার মালিকানা থাকায় এঁরা দেশরত্ন হয়ে শোভা পান। তবু জেনে রাখুন, জাতীয় সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট যত টাকা মার গেছে সব বড়ো মালিকদের হাতে, তার মাত্র সিকিভাগ জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করতে পারলেই মানুষের পকেট থেকে একপয়সা খরচ না করে টিকাকরণ, হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ, ইনডোর, আউটডোর, এমনকি আইসিইউ—এসবই হয়ে যেত।

এইসব 'বড়োলোক'-দের ঘাড় ধরে টাকা ফেরত নেবার কাজটা কোনো সরকার করছেন না। আর স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ খরচ করার চেষ্টাও করছেন না। 'ছোটোলোক'-কে তুষ্ট করার সস্তা উপায় তাঁরা জানেন। তাই এদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেবার জন্য দুটো কাজ সরকারগুলো খুব দক্ষতার সঙ্গে করছে। এক, নানা ছোটো-বড়োমাপের জনমোহিনী প্রকল্প এনে, নিখরচায় স্বাস্থ্যবিমা করে দিয়ে, মানুষকে তুষ্ট রাখছেন আর বিমার টাকাটা প্রাইভেট স্বাস্থ্যব্যাবসার হাতে তুলে দিচ্ছেন। দুই, ডাক্তারদের গণশত্রু সাজিয়ে, কোনো অঘটন ঘটলেই তার জেরে ডাক্তার পিটিয়ে, আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার করে চিকিৎসককে হয়রান করে, মানুষের সামনে এক চটজলদি সমাধান হাজির করছেন। আর এর ফলে ডাক্তাররা জনস্বাস্থ্যের এই অব্যবস্থা নিয়ে সরব হতে আরও ভয় পাচ্ছেন।

এ-রোগের ওষুধ কিন্তু ডাক্তারদের হাতে নেই, আছে আপনাদের হাতে।

বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

বিগত কয়েক বছর ধরে,আমি যে হাসপাতালটির সঙ্গে যুক্ত আছি, সেটির নাম হল—রাণী অশ্রুমতী টিবি হসপিটাল। সংক্ষেপে—আর.এ.টি. বি.হসপিটাল। জলপাইগুড়ি শহরের জাস্ট বাইরে এই হাসপাতালটি, এককালে বেশ নিরিবিলি ছিল। ইদানীং আশপাশের ভোল পালটেছে। লোকলস্কর চ্যাঁভ্যাঁ বেড়েছে। বেড়েছে টোটোর লাইন। কারণ এর ঠিক পাশটিতেই তৈরি হয়েছে দশতলা জুড়ে—জলপাইগুড়ি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সেখানে রাজকীয় ব্যবস্থা। ঝকঝকে তকতকে বেড, চারখানা জাম্বো সাইজের কথা বলা লিফ্ট, গদি মোড়া ট্রলি, হুইল লাগানো চেয়ার। যে যাই বলুক, অন্তত যান্ত্রিক পরিকাঠামোর দিক দিয়ে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে বই কী।

আমি সাধারণ মানুষ। স্কুটি ভরসা। এখন হাত ভাঙা। তাই টোটো চাপি। শুনি মন দিয়ে, আমার সহযাত্রীরা কে কী বলছে। আর সেসব শুনেই মোটামুটিভাবে যা বুঝলাম—লোকজন বেশ খুশি। "সেইই ব্যবস্থা বুঝলা? ঢোকার টাইমে ব্যাগ চেক করে পুলিশ . . . পান বিড়ি আছে কিনা . . . ভেলোর . . . পুররা ভেলোর" ভালো লাগে শুনে। শত হোক, আমার ডিপার্টমেন্টের সুখ্যাতি হচ্ছে।

অসুবিধা তো এখনও আছে মেলা . . . থাকবেও . . . কিন্তু এই যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেড, এই যে সাফসুতরো বাথরুম, এই যে গদিমোড়া চেয়ার—এগুলো একপ্রকার স্বস্তিদায়ক তো বটেই। একথা মানতে তো এতটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই হাসপাতালে, নিজের বাপ-মা-কে ভর্তি করতে হলেও, দ্বিধা হবে না এতটুকু। হাসপাতাল মানেই যে, আস্তাকুঁড় আর যমের দুয়ার, এই ধারণাটুকু থেকে তো অন্তত মুক্তি দিতে পেরেছি রোগীদের।

তা সে যাক গে। ওখানে আমি শুধু ইমারজেন্সি নাইট ডিউটি করি। বাদবাকি কিছু করার বিদ্যেবুদ্ধি নেই খুব একটা। আমার কাজ হল—"আর. এ. টি.বি" নিয়ে। আমার কাজ হল—টিবি রোগী নিয়ে।

টিবি এককালে অচ্ছুত রোগ ছিল। টিবি হলেই রুগীকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়া হত—স্যানেটোরিয়ামে। রাজ কাপুরের "আহ্" বলুন বা মিয়াজাকির "মাই নেবার টোটোরো", হিরো হিরোইনদের ঠাঁই জুটত, শহর প্রান্তিক স্যানেটোরিয়ামেই। ক্রমে জনসচেতনতা বাড়ল। ১৯৯৭ সালে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবং WHO-র যৌথ উদ্যোগে "ন্যাশনাল প্রোগ্রাম" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল—সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী কর্মসূচি বা Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP). এলাকাভিত্তিক বানানো হল—টিউবারকিউলোসিস ইউনিট, নিয়োগ হল হাজারে হাজারে, লাখে লাখে স্বাস্থ্যকর্মী, আর তৈরি হল স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল।

টিবি কী?

টিবি হল একটি ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ। এ রোগে, মূলত ফুসফুস আক্রান্ত হয়। তবে মজার কথা এই যে, ফুসফুস বাদ দিয়েও, শরীরের প্রায় সর্বত্র টিবি হতে পারে।

চামড়া?—হ্যাঁ
চোখ?—হ্যাঁ
ব্রেন?—হ্যাঁ
পেট?—হ্যাঁ

হয় না খালি, নখ আর চুলে। টিবি ব্যাকটিরিয়া, বেজায় বেয়াড়া একটি মাল। হাজার হাজার বছর ধরে, মানুষের সাথে তার বসত। তার আগেও নিশ্চয়ই ছিল। টেক্সাসের গবেষকরা, বর্তমান মানুষের দাদু, হোমো ইরেক্টাসের শরীরেরও "টিবি মেনিনজাইটিস"-এর সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু সবচাইতে পুরোনো প্রামাণ্য টিবি রোগীটি—একটি মিশরীয় মমি।

এ রোগকে যতই, গরিবের ঘোড়ারোগ বলা হোক না কেন, রবার্ট লুই স্টিফেনসন থেকে শুরু করে এডগ্যার অ্যালেন পো, সুকান্ত থেকে শুরু করে অমিতাভ বচ্চন অনেক প্রথিতযশা মানুষই ভুগেছেন টিবিতে।

কারণ?

কারণ দু-টি। এক. আকাশে বাতাসে সবচাইতে বেশি যে জীবাণুটি "চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়" সেটি হল টিবি ব্যাকটিরিয়া। এবং দুই.

টিউবারকিউলোসিস ব্যাকটিরিয়া

মহাধুরন্ধর এই জীবাণু, কেবলই নিজের ভোল পালটে ফ্যালে এমন ভাবে যে, "যায় না তারে বাঁধা"। যুগে যুগে মানবসভ্যতা, বিভিন্ন মাপের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে টিবি জীবাণু ধ্বংস করতে।

আর জীবাণুটি প্রত্যুত্তরে কী করেছে?

নিজের চারপাশে ঢালের মতো বর্ম তৈরি করে, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়েছে, শরীরে অতি থেকে অতি অভ্যন্তরে। যুদ্ধ যেই শেষ, তলোয়ার যেই খাপবন্দি, মানুষ যেই-ই নিশ্চিন্ত, অমনি বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া, ঢাল সরিয়ে, বাসা বেঁধেছে ফের সে। মিউটেশনের পর মিউটেশন। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে ঢাকতে ঢাকতেএএএএ টিবি ব্যাকটিরিয়া, আজ বিন লাদেনের থেকেও ঢের ঢের ঢের বেশি—ধুরন্ধর দুশমন।

উপায় কী?

উপায় একটাই। RNTCP-র ট্যাগ লাইন যাকে বলছে—"পুরা কোর্স, পাক্কা ইলাজ" নাগাড়ে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে রোগীকে ছ-মাস (সাধারণ টিবি), নাগাড়ে চালাতে হবে আক্রমণ, শরীরের কোণায় কোণায়, শিরায় শিরায়, বইয়ে দিতে হবে টিবি নিধকের ঢল . . . ব্যাকটিরিয়া ব্যাটা যতই ঘাপটি মেরে থাকুক, চোখ খুললেই সে যেন দেখতে পায়, তার চারিপাশে উদ্যত অসি ঔষধ। তবেই রোগমুক্তি সম্ভব।

কিছু কিছু পাঠক অলরেডি উশখুশ শুরু করেছেন—সব্যসাচী, ব্র্যাকেট মেরে সাধারণ টিবি লিখল কেন? তার মানে সেনগুপ্ত সাহেব কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

আজ্ঞে না। চাপিনি। বলতাসি। অসাধারণ টিবিও হয় বই কী। তাকে বলে, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। সংক্ষেপে—DRTB। সাধারণ টিবিঘাতী ওষুধ, এসব টিবিতে কাজ করে না মোটেই। গ্রাম্ভারী নামের সব সৈন্যসামন্ত (পড়ুন ওষুধ ইঞ্জেকশন) নাগাড়ে লড়িয়ে যেতে হয় ন-মাস থেকে ছত্তিরিশ মাস। তবে গিয়ে, হয়তো বা মুক্তি। (DRTB ক্যান্সারের মতোই ভয়ংকর) আর আমার কাজটি হল মূলত এই DRTB রোগীদের নিয়েই। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর—এই পাঁচটি জেলার সমস্ত ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগী, বস্তুত পক্ষে, আমার হাসপাতালের আন্ডারে।

কেন হয় DRTB?

কারণ তো মেলা। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচাইতে প্রথম যে কারণটি, সেটি হল আধাখ্যাঁচড়া এবং ভুলভাল চিকিৎসা। যে সমস্ত টিবি রোগী, চিকিৎসার মাঝ পথে ধড়াম করে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, DRTB হয় প্রধানত তাঁদেরই। আর হয় সেই সমস্ত মানুষদের, যাঁরা, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ দোকানে গিয়ে, মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক সাঁটান। এছাড়া, আরও একটি গ্রুপের হয় বই কী। এর মধ্যে আমার বেশ কিছু আত্মীয়ও পড়েন। "ধুররর, শাল্লা ঢপের এম বি বি এস ডিগ্রি . . . ওষুধ কোম্পানির পয়সা খায় বলে গাদাখানিক ওষুধ লিখেছে . . . ওওওও দাদা, . . . আপনি এক নম্বর ওষুধটা তিন দিনের আর দু-নম্বরটা দু-দিনের দিন তোহ্ . . . তারপর না হলে বড়ো ডাক্তার দেখাব . . ."

অযৌক্তিক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার,

হে পাঠক, জেনে রাখুন, আপনাকে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির দিকে ঠেলে দিতে পারে। এবং দিচ্ছে।

সুধী, গুগুলজ্ঞানী এবং আমাদের ঢপের ডাক্তার ভাবা আত্মীয়স্বজন—সাবধান। ডাক্তার আমরা এমনি এমনি হইনি। এটা আমাদের স্পেশালিটি। আপনার ব্যালেন্স শিটে আমি ক্যারদানি মারলে যা হবে, আমার প্রেশক্রিপশনে আপনি পাকামি মারলে, তার চাইতেও ঢের বেশি খারাপ হবে, সেটা মাথায় রাখুন। একটা কথা এই স্থানে বলা প্রয়োজন। যদি ভাবেন যে আপনি গাড়ি চড়েন, আপনার বউ জিনস প্যান্ট পরেন, আপনি পার্টিতে জনি ওয়াকার (আহা) প্যাঁদান, আর তাই টিবি আপনার হবেনি কো, তবে আপনি মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন। টিবি হল প্রেমের মতো। বড়োলোক গরিব লোক দ্যাখে না। সোজ্জা হামলে পড়ে। Trust me, আমি গত দশ বছর ধরে, বিভিন্ন হাসপাতালে টিবি রোগী নিয়ে কাজকম্মো করছি। আমার রোগী তালিকায় যেমন চা-বাগান শ্রমিক আছে তেমনই দার্জিলিং-এর নামজাদা বোর্ডিং স্কুলে পড়া বাচ্চাও আছে। হাঁড়িয়া টানা রিকশাওয়ালা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে ফিলিম আর্টিস্ট। আর আপনার যদি ডায়াবেটিস বা এইচ. আই.ভি. থেকে থাকে, আপনি যদি অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ খান, আপনার যদি প্রয়োজন হয় ডায়ালিসিস . . . তবে তো আর কথাই নেই। আপনি, টিবির, মনপসন্দ, খাদ্য।

মনে রাখবেন, ২০১৬ সালের তথ্য বলছে, প্রতি পাঁচ মিনিটে, দু-

জন করে টিবি রুগী মারা যায় আমাদের দেশে। আপনি বলবেন, সরকার তাহলে এইসব প্রোগ্রাম ফ্রোগ্রাম চালিয়ে এদ্দিন ধরে করলটা কী? আমি বলব, উত্তর আগেই দিয়ে দিয়েছি। টিবি ব্যাকটিরিয়ার আশ্চর্য রকমের মিউটেশন করার ক্ষমতা, এবং পুরো কোর্স কমপ্লিট করার প্রতি, আমাদের উন্নাসিকতা, আজ এমন একটা পরিস্থিতির তৈরি করেছে, যে, আজ বাদে কাল আমার আপনার নাতি নাতনি প্রত্যেকে টিবি রোগাক্রান্ত হলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অতএব . . . সামলে কাকা, সুমলে কাকিমা। সরকার শুধু, পরিষেবাটুকুই দিতে পারে। মানুষ সেই পরিষেবাকে হ্যাক থু করে, ক্যারদানি মারলে, তাতে আখেরে ক্ষতি মানুষেরই।

এইবারে আসল কথা। আপনার করণীয়টি ঠিক কী? টিবি রোগ যেই হেতু প্রধানত ফুসফুসে বাসা বাঁধতেই পছন্দ করে, তাই দু-সপ্তাহের বেশি নাগাড়ে কাশি হলে অথবা কফে রক্ত পড়লে অথবা ওজন হঠাৎ দুম করে কমে গেলে অবিলম্বে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কফ পরীক্ষা করান বিনা খরচে। আমি আবারও বলছি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। প্রাইভেট ল্যাবে নয়। RNTCP-র অধীনস্থ সরকারি ল্যাবগুলিকে নিয়মিত যেসব মানদণ্ডের

যে সমস্ত টিবি রোগী, চিকিৎসার মাঝ পথে ধড়াম করে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, DRTB হয় প্রধানত তাঁদেরই। আর হয় সেই সমস্ত মানুষদের, যাঁরা, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ দোকানে গিয়ে, মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক সাঁটান।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, প্রাইভেটে সেসবের বালাই নেই। টিবির নির্ণয়, সঠিকভাবে, শুধুমাত্র এবং শুধুইমাত্র তাই সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরিতেই হতে পারে। সরকার দামি থেকে দামি যন্তর বসিয়েছে হাসপাতালগুলোতে, যেখানে মাত্তর দুই ঘণ্টাতে জানা যায় শরীরে টিবি আছে কিনা। সঙ্গে জানা যায় টিবি-টি সাধারণ টিবি না DRTB। এই একই টেস্টের প্রাইভেট মূল্য—পাঁচটি হাজার টংকা। সাধারণ টিবির ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ প্রায় আট থেকে দশ হাজার। আর DRTB? সেখানে চার এবং পাঁচের পেছনে, পাঁচখানা শূন্য নিয়ে কাজ চলে। RNTCP ব্যয়ভার বহন করে, এর পুরোটাই। সঙ্গে বহন করে, রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের যাতায়াত খরচ, ইনসেন্টিভ এবং যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষার দাম। সবচাইতে বড়ো কথা হল, প্রধানমন্ত্রী এবং রিকশাওয়ালা, এই দু-জনের যদি একই ধরনের টিবি হয়ে থাকে, তবে, RNTCP একই রকম পদ্ধতিতে চিকিৎসা করবে দু-জনেরই। প্রাইভেট সেক্টরের নানা মুনির নানা মত, বা পকেট বুঝে নিদানের বিড়ম্বনা, এখানে নেই। সরকার কিছুই করে না, এই কথাটা বলার আগে, এইবারে, দু-বার ভাববেন। কেমন?

অনেক জ্ঞান হল। যে কথা বলতে গিয়ে এই রচনার সূত্রপাত, সেইটে বলি। আর.এ.টি.বি হাসপাতালে, যে কাজটি করতে আমার সবচাইতে ভালো লাগে, সেটি হল রাউন্ড। আউটডোর শেষ করে, দুটো পাঁচ দশ নাগাদ যখন রাউন্ডে যাই আমি, তখন সব্বাইকার লাঞ্চ হয়ে গেছে। কেউ কম্বল মুড়ি দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, তো কেউ ঘোঁট পাকিয়ে লাল গুটি গলাচ্ছে সরকারি ক্যারাম বোর্ডে। অধিকাংশ টিবি রুগীরই ছুটি হয়ে যায় দিন সাতেকের মধ্যে। কিন্তু তা বাদেও, বেশ কিছু ভবঘুরে টিবি রোগী রয়েছে, যাদের বাপ মা ভাই বোন কেউ কোথাও নেই। তারা কোর্স শেষ হওয়া অব্দি এইখানেই থাকে।

এই রুগীগুলির সঙ্গে আমার বড্ডো ভালোবাসার টান। এরা রেডিওতে, "ইস তরাহ আশিকি কা অসর ছোড় যাউঙ্গা" শুনলে, আমি "আহ্‌হা" বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, এরা হাতে নেল পালিশ পরলে আমি

তবু ওরা হাসে। তবু ওরা স্বপ্ন দেখে। তবু ওরা আমার হাতে ব্যান্ডেজ দেখলে বলে—"দাদ্দা . . . তোমার হাত কবেএএএ ভালো হবে গো?"

"ওহেহাওওও" বলে, আওয়াজ মারি।

মহিলা DRTB রোগী আছে কয়েকজন, যারা মাঝেমধ্যেই চুলের বিভিন্ন রকম কায়দা-মারা বিনুনি করে, লজ্জা লজ্জা মুখে বসে থাকে রাউন্ডের অপেক্ষায়। আমি শুধু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলি—"আরিব্বাস, অমুক . . . তোকে তো হেব্বি লাগছে রে" ব্যস। এটুকুতেই ওরা খুশি। ওদের দিনে চৌদ্দটা করে ট্যাবলেট খেতে হয় রোজ, ওদের প্রতিদিন সহ্য করতে হয় পাছাতে কঠোর ইঞ্জেকশনের যন্ত্রণা . . . তবু ওরা হাসে। তবু ওরা স্বপ্ন দেখে। তবু ওরা আমার হাতে ব্যান্ডেজ দেখলে বলে—"দাদ্দা . . . তোমার হাত কবেএএএ ভালো হবে গো?" ওরা, নববর্ষে কার্ড তুলে দেয় হাতে এঁকে। ওরা, হোলিতে আবীর পায়ে ছোঁয়ায় ভালোবেসে। ওরা ছুটি হয়ে বাড়ি চলে গেলেও, ফোনে যোগাযোগ রেখে দেয় ছুতোনাতায়। আর হ্যাঁ চিঠিও দেয় সময় সুযোগে। অথচ, আমি জানেন, কিচ্ছুটি কিন্তু করতে পারি না বিনিময়ে . . . শুধু গাইড লাইন মেনে চিকিৎসাটুকুই তো করি . . . অথচ . . . অথচ . . . এ তো আমার ডিউটি . . . এর জন্যই তো মাইনেও পাই ভালোরকম . . . তাও ওরা ভালোবাসে . . . ব্যস। আর দরকারটাই বা কী জীবনে? যা মাইনে পাই, তাতে ভালোভাবেই দিন চলে যায় আমার। আর যা ভালোবাসা পাই, তাতে আমার ভাঁড়ার উপচে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। গালি কি দেয় না কেউ? দেয় তো, বিলক্ষণ দেয়। হয়তো

কোনোদিন কোনো রুগীর বাড়ির লোক আমার চামড়াও তুলে নেবে অনাগত ভবিষ্যতে কিন্তু . . . কিন্তু এই যে ফোনে ওরা বলে—"স্যার আপনি এখনও আছেন তো . . . আপনি যাবেন না তো এখান থেকে?" এটাই বা কম কী?

ইমোশন লেবড়ে হাঁটা তো থামাতে শিখলাম না আজও। কাল হয়তো এর জন্য বিস্তর আক্কেল সেলামিও দিতে হবে . . . কিন্তু এটাই আমি। হ্যাঁ কাজি তৌফিকদা, হ্যাঁ নন্দাদি, তোমরা আমাকে যতই বোকাপাঁঠা সব্য ভাবো, তোমরা আমাকে যতই "আর.এ.টি.বি-র বাঞ্ছারাম" বলো, আমি এইরকমটা বোকা আর অ্যাম্বিশনলেস হয়েই কাটিয়ে দিতে চাই সারাটা জীবন। গাধা দিয়ে কি কোনোদিনও লাঙল চাষ হয়েছে? না হবে?

হাঁচি বা কাশির সময়, তালু নয়, বাহু ঢেকে হাঁচুন/কাশুন, দৈনন্দিন কাজের সময় করতল বারবার ব্যবহার হয়, তাতে সংক্রমণ ছড়ায়।

লেখা বড়ো হচ্ছে গুণীজন এবং সুহৃদবৃন্দ বারবার সাবধান করেছেন—পাঠকের ওপর বোঝা চাপানো—পাপ। তাই, এসব ভাটের সেন্টু ছেড়ে কয়েকটা কাজের কথা বলে শেষ করি—

১. হাঁচি বা কাশির সময়, তালু নয়, বাহু ঢেকে হাঁচুন/কাশুন (উপরে ছবি দ্রষ্টব্য), দৈনন্দিন কাজের সময় করতল বারবার ব্যবহার হয়, তাতে সংক্রমণ ছড়ায়।

২. হ্যান্ডশেক পরিত্যাগ করে, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং সত্যজিৎ খ্যাত, "কেমন আছেন নমস্কার" করুন।

৩. যেখানে সেখানে কফ থুথু ফেলা বন্ধ করুন।

৪. কথায় কথায়, নাকে মুখে হাত দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। এতে ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

৫. দু-সপ্তাহের বেশি নাগাড়ে কাশি হলে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা করান।

৬. ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ নেবেন না।

৭. অ্যান্টি টিউবারকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে, এমন অ্যান্টিবায়োটিক, টিবি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের আগে দু-বার ভাবুন—এটা ছাড়া অন্য কোনো ওষুধেও কাজ চলবে কিনা (ডাক্তার পাঠকদের জন্য) এবং হ্যাঁ, যদি নিকট অতীতে সুগার টেস্ট না করিয়ে থাকেন, তবে অবিলম্বে করান। ডায়াবেটিস নিশব্দ ঘাতক।

যদি সুগার ধরা পড়ে, তবে ডাক্তারের কাছে যান, আর যদি ধরা না পড়ে???

নলেনগুড়ের নরমপাক অর্ডার দিন দেকিনি। বোকা পাঁঠা সব্য, খেতে খুব ভালোবাসে।

(নীচের ছবিটি আমি নেট দেখে দেখে, আউটডোরের ফাঁকে এঁকেছি স্বহস্তে। অন্যদিন ছবি কেমন হল, তাই নিয়ে দ্বিধায় থাকি। আজ নেই। কারণ, একটি ছয় বছরের বাচ্চা, আমার টেবিলে এই আঁকাটিকে দেখে জুলজুল করে তাকিয়ে ছিল। আমি তখন তার মায়ের প্রেসক্রিপশন লিখছিলাম। হঠাৎ, খেয়াল করাতে বললাম— "কী বল তো এটা?" বাচ্চাটি রীতিমত অভিনয় করে দেখালো—"এইইই যেএএ, এই ভাবে হাঁচবো নাই, . . . আর এইইই ভাবে হাঁচব।" ব্যস, আর কী? বাচ্চার মা, বাচ্চার গুণপনা দেখে খুশ, আর আমি আমার . . .) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

রোগটার নাম অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস

সবচেয়ে বেশি যে বাতে মানুষ ভোগেন, তা হল অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের NHS-এর রোগীদের জন্য জ্ঞাতব্য তথ্য থেকে প্রস্তুত এই প্রতিবেদন। জানাচ্ছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

গাঁট বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা এবং শক্তভাব (stiffness) হল অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের প্রধান উপসর্গ। কারুর কারুর অবশ্য গাঁটে ফোলা, গাঁটে টিপলে ব্যথা, গাঁটটির নড়াচড়ায় খরখরে শব্দ হয়। কখনো জোড়ের নড়াচড়া করার সীমা কমে যায়। কম ব্যবহারের ফলে মাংসপেশি দুর্বল হয়, শুকিয়ে যেতে পারে। সবার কষ্ট একই রকম হবে এমনটা নয়, আবার একই মানুষের একাধিক জোড় আক্রান্ত হলে সব জোড়ে সমান উপসর্গ থাকবে এমনটাও নয়।

কারুর উপসর্গ থাকে অল্প, আসে-যায়। অনেকের কষ্ট লেগেই থাকে, তীব্রতা এত বেশি যে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে উঠতে অসুবিধা হয়।

যেকোনো জোড়েই অস্টিয়ো-আর্থ্রাইটিস হতে পারে, তবে বেশি আক্রান্ত হয় হাঁটু, কোমর (hip joints) আর হাতের ছোটো জোড়গুলি।

হাঁটুর অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস

হাঁটুতে এই রোগ হলে, সময়কালে দু-টি হাঁটুই আক্রান্ত হয়। অবশ্য আঘাত বা অন্য কোনো রোগে একটা হাঁটু প্রভাবিত হওয়া যদি অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের কারণ হয়, তাহলে আলাদা।

সবচেয়ে বেশি হাঁটু ব্যথা হয় হাঁটলে, বিশেষত চড়াই বা সিঁড়ি ওঠানামা করার সময়। চলতে চলতে কখনো কখনো হাঁটুটা যেন ছেড়ে দেয়, কখনো-বা হাঁটুটা সোজা করা কঠিন হয়ে পড়ে। জোড়টা নড়াচড়া করার সময় হালকা ঘষার আওয়াজ হয় কোনো কোনো সময় ।

কোমরের অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস

এ রোগে কোমরের হিপ জয়েন্ট নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। জুতো-মোজা পরতে, গাড়িতে ওঠানামা করতে কষ্ট হয়। সাধারণত কুঁচকি আর জোড়ের ঠিক বাইরেটায় ব্যথা হয়। নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে, অবশ্য বিশ্রাম করার সময় বা ঘুমোনোর সময়ও ব্যথা হতে পারে।

হাতের অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস প্রধানত হাতের তিনটে এলাকাকে প্রভাবিত করে:

১. বুড়ো আঙুলের গোড়ায়

২. আঙুলের ডগার কাছের জোড়গুলোতে

৩. আঙুলের মাঝের জোড়-গুলোতে।

আঙুলগুলো শক্ত, ব্যথা আর ফোলা হয়ে থাকে, আঙুলের জোড়ের ওপর উঁচু হয়ে থাকে। পরে ব্যথা কমে, অনেক সময় থাকেই না আর। কিন্তু ফোলা আর উঁচু থেকে যেতে পারে।

আক্রান্ত জোড়গুলো বাইরের দিকে বেঁকে থাকতে পারে। কখনো-বা আঙুলের পেছনে ব্যথাযুক্ত তরল-ভর্তি থলি হয়ে থাকে। কবজি থেকে যেখানে বুড়ো আঙুল—সেখানে ফুলে থাকে অনেকসময়। লেখা, বয়াম খোলা, চাবি ঘোরানোর মতো কাজ করতে তাতে অসুবিধা হতে পারে।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস কেন হয়?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের জোড়গুলোতে অল্প মাত্রায় চোট-আঘাত লাগতেই থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শরীর তা থেকে হওয়া ক্ষতি সারিয়ে নেয়, আমরা কোনো কষ্ট বুঝতেই পারি না।

কিন্তু অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে হাড়ের প্রান্তে থাকা তরুণাস্থিগুলো ভেঙে যায়, ফল—ব্যথা, ফোলা আর জোড়টা নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা।

ঠিক কারণটা জানা নেই, কিন্তু দেখা গেছে কিছু অবস্থায় অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে:

✦ জোড়ে আঘাত: কোনো আঘাত বা অপারেশনের ক্ষত সেরে ওঠার আগেই যদি সেই জোড়কে বেশি ব্যবহার করা হয়।

✦ অন্য রোগের ফলশ্রুতিতে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস—রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাত (gout)-এ বেশি আক্রান্ত জোড়ে

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস হতে পারে।

✦ বয়স—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

✦ পরিবারে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস থাকলে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ে, যদিও এর জন্য দায়ী কোনো জিনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

✦ স্থূলতা—ওজন বেশি থাকায় জোড়গুলোতে চাপ বেশি পড়ে। বিশেষত কোমর ও হাঁটুর মতো যে জোড়গুলো ভার বহন করে, সেগুলো বেশি প্রভাবিত হয়।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস রোগ-নির্ণয় কীভাবে?

আপনার ডাক্তার অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস সন্দেহ করবেন যদি:

- আপনার বয়স ৫০ বছর বা তার বেশি হয়।
- আপনার জোড়ে ব্যথা আছে, কাজ করলে যে ব্যথা বাড়ে।
- সকালে জোড়ে শক্তভাব যা ৩০ মিনিটের কম থাকে, অথবা শক্তভাব থাকেই না।

উপসর্গ যদি এর থেকে আলাদা হয়, তাহলে হয়তো অস্টিওআর্থ্রাইটিস নয়। যেমন সকালে জোড়ে শক্তভাব যদি বেশি সময় ধরে থাকে, তাহলে তা হয়তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কারণে।

সাধারণত এক্স-রে বা রক্তপরীক্ষার দরকার হয় না রোগ-নির্ণয়ে। অস্থিভঙ্গ (হাড়ভাঙা) বা রিউমাটয়েড বাতের সঙ্গে আলাদা করার এক্স-রে বা রক্তপরীক্ষা করতে হতে পারে।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস এক দীর্ঘস্থায়ী রোগ, তাকে সারানো যায় না। তার মানে কিন্তু এমনটা নয় যে অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হবেই। অনেক সময় উপসর্গ আস্তে আস্তে কমেও যায়। উপসর্গ কমানোর নানান চিকিৎসা রয়েছে।

অল্পস্বল্প উপসর্গ থাকলে, যেসবে উপকার পেতে পারেন:

- নিয়মিত ব্যায়াম
- ওজন বেশি থাকলে ওজন কমানো
- যথাযথ জুতো ব্যবহার
- দৈনন্দিন কাজের সময় জোড়ে চাপ কমানোর জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া।

উপসর্গ বেশি হলে এর সঙ্গে বেদনানাশক ওষুধ এবং ফিজিয়োথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যায়াম করতে হতে পারে।

খুব কম কিছু রোগীর এসব চিকিৎসায় ফল না হলে জোড়কে সারাতে, মজবুত করতে বা বদলাতে (প্রতিস্থাপন করতে) অপারেশন করতে হয়।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস রোগীর বয়স বা ফিটনেস যাই হোক না কেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার একটা হল ব্যায়াম। ব্যায়াম এমন হওয়া উচিত যাতে মাংসপেশিগুলো মজবুত হয় এবং সাধারণ ফিটনেসও ভালো হয়। অনেকে ভাবেন ব্যায়াম করলে কষ্ট বাড়বে, আসলে কিন্তু তা নয়। ব্যায়াম এছাড়াও ওজন কমাতে সাহায্য করে, শরীরের posture উন্নত করে, চাপ কমায়।

বেশি ওজন বা স্থূলতায় কিছু জোড়ে চাপ বেশি পড়ে। শারীরিক সক্রিয়তা ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসে ওজন কমানো যায়। কীভাবে নিরাপদে ওজন কমানো যায়, তার জন্য ডাক্তার ও ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিন।

বেদনানাশক হিসেবে শুরুতে ব্যবহার করা উচিত প্যারাসিটামল। মনে রাখা উচিত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা ৪গ্রাম অর্থাৎ ৫০০ মিলিগ্রামের ৮টা বড়ি। এতে ব্যথা না কমলে আইবুপ্রোফেন বা ডাইক্লোফেনাক অথবা সেলেকক্সিব বা ইটোরিকক্সিব দেন ডাক্তার। কখনো কোডিন, ট্রামাডলের মতো আফিমজাত ওষুধও দেওয়া হয়, তবে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ঝিমুনি, বমিভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে।

অনেক সময় অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে ব্যথার মলম (টপিকাল NSAID—অস্টেরয়েড প্রদাহরোধী ওষুধ) দেওয়া হয়, তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ব্যবহার করা হয় ক্যাপাসেসিন (capasaicin) মলমও। লঙ্কার সক্রিয় এই উপাদান বেদনার অনুভূতিবাহী স্নায়ুগুলোকে ব্লক করে ব্যথা কমায়, তবে পুরোপুরি কাজ করতে এ মোটামুটি একমাস সময় নেয়।

কখনো কখনো অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে জোড়ে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। যদি তাতে লম্বা দিন ফল পাওয়া যায় তাহলে আবার দেওয়া যেতে পারে, তবে বছরে তিনবারের বেশি নয় আর দুটো ইঞ্জেকশনের মধ্যে যেন অন্তত তিনমাসের ফারাক থাকে।

অপারেশন বাদে অন্য সব চিকিৎসায় যাঁরা ফল পাননি, তাঁদের আক্রান্ত জোড়ে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় অনেক সময়—কয়েক সপ্তাহে পাঁচটা অবধি ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে। হায়ালুরোনিক অ্যাসিড এমনিতে জোড়ের ভেতরকার সায়ানোভিয়াল তরলে থাকে—পিচ্ছিলকারক ও শক-অ্যাবসর্বার হিসেবে কাজ করে। এই ইঞ্জেকশনে লাভ পাওয়া গেলে ছয় মাস ছাড়া আবার দেওয়া যেতে পারে।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও ওষুধপত্র বাদে অন্যান্য কিছু চিকিৎসায় কখনো কখনো ব্যথা কমে ও দৈনন্দিন কাজকর্ম করায় সুবিধা হয়।

➤ TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)—বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দিয়ে ব্যথার অনুভূতি-নিয়ন্ত্রণকারী সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুপ্রান্তগুলোকে অসাড় করে দেওয়া হয় এতে।

➤ গরম বা ঠান্ডা সেঁকে ফল পান কেউ কেউ।

➤ ফিজিয়োথেরাপিস্ট দ্বারা জোড়ের স্ট্রেচিং করিয়ে ফল পান কেউ কেউ।

➤ বিশেষ ধরনের জুতো যাতে শক-অ্যাবসর্বিং শুকতলা আছে, তাতে ভার বহন করতে সুবিধা হয়।

➤ লেগ ব্রেস আর সাপোর্টেও ভার বহনে কিছু সুবিধা হয় কারুর কারুর, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া এসব ব্যবহার করা উচিত নয়।

➤ কোমর বা হাঁটুর অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হলে লাঠি বা ছড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেদিকটা আক্রান্ত তার বিপরীত দিকে লাঠি ব্যবহার করা উচিত, তাতে আক্রান্ত দিকে ভার কম পড়ে।

➤ জোড়ে খুব ব্যথা হলে যদি জোড়কে বিশ্রাম দিতে হয় তাহলে বন্ধ-ফলক (splint) ব্যবহার করা যায়।

অপারেশন

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে অপারেশন লাগে কম ক্ষেত্রেই, অপারেশনেরও রকমফের আছে।

ঠিকঠাক চিকিৎসা পেলে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস নিয়ে সুস্থ, কর্মক্ষম জীবনযাপন করা যায়। অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস রোগের তীব্রতা বেড়েই চলবে এবং তা থেকে বিকলাঙ্গতা হবেই এমনটা নয়।

✸ আর্থ্রোপ্লাস্টি (arthroplasty)—এতে জোড়কে প্রতিস্থাপন করা হয় প্লাস্টিক-ধাতু দিয়ে তৈরি কৃত্রিম জোড় দিয়ে।

✸ আর্থ্রোডেসিস (arthrodesis)—জোড়টাকে স্থায়ীভাবে জুড়ে দিয়ে নড়াচড়া বন্ধ করে দেওয়া হয় এই অপারেশনে।

✸ অস্টিয়োটমি (osteotomy)—জোড়ের নীচে বা ওপরে ছোটো এক টুকরো হাড় কেটে বাদ দেওয়া বা জোড়া হয় এই অপারেশনে, যাতে জোড়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ওপর চাপ না পড়ে।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের কিছু রোগী আকুপাংচার করান। এই চিকিৎসা কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত নয়।

গ্লুকোসামিন সালফেট ও কন্ড্রিটিনের মতো কিছু পুষ্টি-পরিপূরক (nutritional supplement) কোনো কোনো ডাক্তার অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে ব্যবহার করেন, কিন্তু তাতে কতটা কাজ হয় সন্দেহ আছে, আর এগুলোর দামও খুব বেশি।

রুবিফাসিয়েন্ট (rubefacient) মলম বা জেল হিসেবে পাওয়া যায়, চামড়ায় ঘষলে লাল হয়ে যায়, গরম ভাব লাগে। অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসে ব্যবহার করেন কেউ কেউ। কিন্তু এর প্রভাবও প্রমাণিত নয়।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস নিয়ে বাঁচা

মনে রাখবেন ঠিকঠাক চিকিৎসা পেলে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস নিয়ে সুস্থ, কর্মক্ষম জীবনযাপন করা যায়। অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস রোগের তীব্রতা বেড়েই চলবে এবং তা থেকে বিকলাঙ্গতা হবেই এমনটা নয়। সঠিক খাবার-দাবার, নিয়মিত ব্যায়ামে মাংসপেশিগুলো শক্তিশালী থাকে, ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে—যা অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের জন্য ভালো, যার অন্য উপকারিতাও আছে।

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস প্রতিরোধ

অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসকে হতে না দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব নয়। কিন্তু যথাসম্ভব চোট-আঘাত বাঁচিয়ে চললে, যথাসম্ভব সুস্থ থাকলে অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি কম থাকে। দৌড়োনো, ওজন তোলার মতো যেসব ব্যায়ামে জোড়ে চাপ পড়ে সেগুলোর বদলে সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটার মতো ব্যায়াম করা ভালো, যেগুলোতে জোড়ে চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টা করে মাঝারি তীব্রতার অ্যারোবিক ব্যায়াম করা সুস্থ রাখবে আপনাকে।

শরীরের সঠিক অবস্থিতি (posture)—কীভাবে বসবেন, দাঁড়াবেন, কাজ করবেন, তাও অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি কমায়। তবে তা নিয়ে আলোচনা থাকবে অন্য লেখায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

ব্যথার উপশম এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার

ডা. মৌসুমী দাস

বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পরে সংক্রমণ এবং অপুষ্টির কারণে মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুরারোগ্য ক্রনিক অসুখগুলি চিন্তার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্ট, স্নায়ুতন্ত্রের কিছু জটিল অসুখই এই মুহূর্তে সমস্যার প্রধান কারণ। উপরন্তু, এইচ আই ভি/এইডস ক্রমশ ক্রনিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জার্মানির একটি সমীক্ষায় ২০০১ এবং ২০১১-র ২৪০০৯টি ডেথ সার্টিফিকেট (২০০১-১১৫৮৫ এবং ২০১১-১২৪২৪) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে চৌত্রিশ শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সার মৃত্যুর কারণ। ২০০১ এবং ২০১১-র ডেথ সার্টিফিকেটগুলি থেকে মৃত্যুর স্থান পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্যসমুহ পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হল হাসপাতালে মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কমে যাওয়ার পাশাপাশি প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট, হসপাইস (অর্থাৎ মুমূর্ষু অনারোগ্য মানুষের শেষ দিনগুলির দেখভালের জন্য আশ্রয়) এবং ভগ্নস্বাস্থ্যদের জন্য বিশেষ বৃদ্ধাবাস (যা কিনা পশ্চিমি দেশে নার্সিং হোম নামে পরিচিত), এইসব স্থানে মানুষের মারা যাওয়ার হার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে, মানুষ তাঁর শেষ দিনগুলি কাটানোর জন্যে টেকনোলজি-সমৃদ্ধ হাসপাতালের পরিবর্তে উপরোক্ত স্থানগুলিকে বেছে নিচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ভারতবর্ষেও পঞ্চাশ শতাংশের বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসাবে হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্ট এই ধরনের অসুখগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় আমাদের দেশও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একই ধাঁচের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এইসব রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সাম্প্রতিককালে একটা গুরুতর চিন্তার বিষয়। এই ধরনের অসুখ, যেগুলির মেয়াদ দীর্ঘকালীন এবং অনেকাংশেই দুরারোগ্য, তাদের, বিশেষত শেষ পর্যায়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্যালিয়েটিভ কেয়ারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ধারণাটা নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকাল থেকেই অসুস্থ মানুষের সেবা করা মনুষ্যসমাজের বৈশিষ্ট্য। সম্রাট অশোক যে ১৮টি প্রতিষ্ঠান ভারতে স্থাপন করেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক হসপাইসগুলির অনেক মিলই পাওয়া গেছে। পশ্চিমি দেশে, সপ্তদশ শতকের শুরুতে ফ্রান্সিস বেকন বলেন যে মানুষের শান্তিপূর্ণ মৃত্যুও চিকিৎসকের পেশার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ধারণার প্রায় কোনো অমিলই নেই। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তনে ডেম সিসিলি মেরী সন্দার্সের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯৬৭ সালে লন্ডনে প্রথম সেন্ট ক্রিস্টোফার হসপাইসটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার' এই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলতে আমরা সেই চিকিৎসাকেই বুঝি যা দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তার পরিজনদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থতাই এর মূল লক্ষ্য নয়। কারণ সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতাও ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য সমানভাবে জরুরি। প্যালিয়েটিভ কেয়ারে এই চারটি বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল—

১. ব্যথা ও অন্যান্য কষ্টদায়ক উপসর্গ থেকে মুক্তি।

২. সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে রোগীকে সুস্থ রাখা।

৩. মৃত্যুকে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সহজভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করা।

৪. অযথা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত না করা।

৫. বেঁচে থাকার শেষ দিনগুলিকে যথাসম্ভব সুখকর এবং তৃপ্তিদায়ক করে তোলা।

৬. রোগীর পরিবার-পরিজনদের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করা।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারে বিভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা করা হয়, লক্ষ্য উপশম। পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—ব্যথা, পেটের সমস্যা, বমি বা বমিভাব, কাশি, শ্বাসকষ্ট, খিদে কমে যাওয়া, দুর্বলতা, প্রস্রাবের সমস্যা, ঘুম না হওয়া, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি।

আজ আমরা সংক্ষেপে ব্যথা বা যন্ত্রণার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করব। চিকিৎসা অর্থাৎ যন্ত্রণার উপশমকারী চিকিৎসা বা প্যালিয়েটিভ কেয়ার আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ কিছুটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ক্রনিক অসুখের শেষ পর্যায়ে এসে মানুষ যে সমস্যায় সব চাইতে বেশি কষ্ট পান, সেটা এই ব্যথা। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসাবে এমন বহু রোগীর সংস্পর্শে এসেছি যাঁদের কাছে ব্যথা একটা মূল সমস্যা। এমনকী এরকমও অনেকে আছেন যাঁরা ভবিষ্যতে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কাজনিত দুশ্চিন্তার শিকার। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আরও কিছু আনুষঙ্গিক সমস্যা। যেমন—ব্যথার জন্য ঘুম না হওয়া, হাঁটাচলা করতে না পারা, খিদে কমে যাওয়া, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি। সুতরাং এই উপসর্গটির গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যথা নিয়ে কিছুটা বিশদে আলোচনা প্রয়োজন।

প্রায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা চলাকালীন ব্যথা অনুভব করেন। সত্তর থেকে নব্বই শতাংশ অ্যাডভান্সড ক্যান্সারের রুগী ব্যথার শিকার হন। এছাড়াও ক্রনিক হার্টের অসুখ, স্নায়ুতন্ত্রের কিছু জটিল অসুখেও ব্যথা ও যন্ত্রণা একটা প্রধান সমস্যা। যেকোনো দুরারোগ্য অসুখে ব্যথার কারণগুলি নিম্নলিখিত—

১. রোগ সম্বন্ধীয়: সফট টিসু, স্নায়ুতন্ত্র, অন্তর্যন্ত্র বা ভিসেরা এবং হাড়ে অসুখ ছড়িয়ে পড়া; স্নায়ুর উপরে চাপ সৃষ্টি করা; মস্তিষ্কের চাপ বৃদ্ধি; লসিকা গ্রন্থির সমস্যার জন্য হাত পা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

২. চিকিৎসাজনিত: সার্জারি, রেডিয়োথেরাপি বা কেমোথেরাপির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণেও ব্যথা, জ্বালা ভাব, ঝিন ঝিন, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা হতে পারে।

৩. অশক্ততাজনিত: কোষ্ঠকাঠিন্য, বেড সোর, গাঁটে ব্যথা।

৪. আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা: কোমরে যন্ত্রণা, আর্থ্রাইটিস, আঘাতজনিত ব্যথা, হার্টের অসুখ ইত্যাদি।

সর্বোপরি ব্যথাকে শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের একটা অনুভূতি হিসাবে না দেখে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় রুগী এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর এর প্রভাব যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে তার চিকিৎসাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। তাই সামাজিক আর মানসিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব নিয়ে সবিস্তার আলোচনা জরুরি। শারীরিক যন্ত্রণার কারণগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন বাকি কারণগুলি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণীতে যাওয়া যাক। সামাজিক দিকগুলি যদি খুঁটিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে এই ধরনের রুগীদের অনেক সময় বেশ কিছু গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, পরিবার এবং আর্থিক সংস্থানের চিন্তা, উপার্জনক্ষমতা কমে যাওয়া অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিবারে ও সমাজে নিজের ভূমিকা হারানো, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এদের মধ্যে অন্যতম। মানসিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধানত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারানো, অযথা রাগ ও বিরক্তি ভাব, ব্যথাজনিত ভীতি, মৃত্যুর আশঙ্কা, অসহায়ত্বের অনুভূতি এগুলো রুগীর জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। ব্যথার আধ্যাত্মিক কারণ বলতে মানুষের নিজেকে দোষারোপ করার প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে। দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করতে করতে অনেকের মনেই নানা প্রশ্নের উদ্রেক হতে থাকে। যেমন, 'আমার সাথেই কেন এরকম হচ্ছে?'; 'জীবনের কী মানে?'; 'এত চিকিৎসার অর্থ কী?'; 'এটা কি কোনো পাপের শাস্তি?' ইত্যাদি প্রশ্নগুলো মাথার ভিতরে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে। এইসমস্ত চিন্তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই জটিল অসুখের সঙ্গে লড়াই করার মানসিক শক্তি তাঁরা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। সুতরাং উপরোক্ত সমস্ত কারণগুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যথা ও যন্ত্রণার চিকিৎসা প্রয়োজনীয়। সামাজিক, মানসিক সমস্যাগুলি উপেক্ষা করে প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্যথা কমানোর ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অ্যাডজুভেন্ট বা সহকারি ওষুধও দেওয়া হয়। তাছাড়াও চলতি ফার্মাকলজিক্যাল থেরাপির পাশাপাশি কিছু পরিপূরক চিকিৎসাও অনেকক্ষেত্রে বেশ উপযোগী। এগুলির মধ্যে আকুপাংচার, টাচ থেরাপি, অ্যারমাথেরাপি, আর্ট থেরাপি, মিউজিক থেরাপি, হিপনোথেরাপি, সাইকোলজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং উল্লেখজনক। এর মধ্যে সব ক-টি হয়তো সকলের জন্য উপযুক্ত বা যথাযথ নাও হতে পারে। কিন্তু সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে তা রুগীকে জীবনযাত্রার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

তবে প্রায় নব্বই শতাংশ রুগীর ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ওষুধের দ্বারাই ব্যথার উপশম সম্ভব। ব্যথা বা যন্ত্রণার চিকিৎসার সফলতা মূল্যায়নের জন্য তিনটি প্রধান লক্ষ্য হল—

১. রাতে ব্যথার দরুন রুগী ও তার পরিজনদের ঘুমের ব্যাঘাত না হওয়া।

২. দিনেরবেলা বিশ্রামের সময় ব্যথা না হওয়া।

৩. হাঁটাচলা বা নড়াচড়া করার সময় ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব না করা।

এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি 'অ্যানালজেসিক ল্যাডার' তৈরি করা হয়েছে। এই 'অ্যানালজেসিক ল্যাডার' ব্যবহার করে ধাপে ধাপে সিঁড়িতে ওঠার মতো ওষুধ এবং তার ডোজ় নির্ধারণ করা সম্ভব। এই ল্যাডার অনুসারে খুব সামান্য ব্যথার জন্য একদম প্রথম ধাপে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি ওষুধের ডোজ় বাড়ানো যেতে পারে। তারপরেও যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যথা না কমে তখন সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে প্যারাসিটামলের সঙ্গে মরফিনের তুলনায় দুর্বল আফিমজাতীয় অর্থাৎ 'ওপিওয়েড' শ্রেণিভুক্ত কিছু ওষুধ যোগ করা হয়। আবার একইভাবে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখা হয় এবং ব্যথা না কমলে মরফিন শুরু করা যেতে পারে। সাধারণত অসহ্য ব্যথার চিকিৎসায় মরফিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। প্রতিক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট ওষুধে যখন ব্যথা কমে যায় তখন সেই ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তী ধাপে যাওয়ার প্রয়োজন

হয় না। তবে ব্যথা কমছে কিনা সে ব্যাপারে রুগীর মতামতই চূড়ান্ত হওয়া উচিত। আত্মীয়স্বজনের থেকে চিকিৎসাধীন ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া বেশি দরকার।

প্রতিটি ধাপেই আরও ভালো ফলাফলের জন্য ব্যথা কমার ওষুধের সঙ্গে কিছু সহযোগী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। যেমন—স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, নিউরোপ্যাথিক ব্যথার জন্য অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ও অ্যান্টিকনভালসেন্ট জাতীয় ওষুধ, মাসল রিল্যাক্সেন্ট, পেটে ব্যথার জন্য অ্যান্টিস্প্যাসমডিকস ইত্যাদি। এছাড়াও দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরোক্ত ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত কারণে অনেক সময়েই অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন। সুতরাং আরও কিছু ওষুধ যেমন—বমির ওষুধ, অ্যান্টাসিড বা গ্যাসের ওষুধ, ল্যাক্সেটিভ বা পায়খানা হওয়ার ওষুধ—এগুলিও খাওয়ার জন্য প্রেসক্রাইব করা যেতে পারে। তবে যে ওষুধই দেওয়া হোক না কেন, সবসময়েই এ-কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মূল উদ্দেশ্য রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য। চিকিৎসার চোটে ব্যথা কমলেও রোগীর কষ্ট বেড়ে গেল, এইটা, আর যাই হোক, প্যালিয়েটিভ কেয়ার হতে পারে না।

মরফিন সম্পর্কে কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা রয়েছে। যার ফলে অনেকেই এই জাতীয় ওষুধ খেতে ভয় পান। তা সে এই ধারণাই হোক যে শুধুমাত্র অসুখের শেষ পর্যায়ে এই ওষুধ দেওয়া উচিত বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় মরফিন কখনোই খাওয়া উচিত নয় অথবা মরফিন মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে সেই ধারণাই হোক। মরফিন নিয়ে নানা মিথ প্রচলিত রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যাতে এইসমস্ত ভুল ধারণার বশবর্তী না হন, তাই এই জাতীয় ওষুধ চালু করার সময় যথাযথ ব্যাখ্যার মাধ্যমে অহেতুক আশঙ্কার নিরসন অবশ্যই প্রয়োজন। মরফিনের দৈনিক ডোজ়কে ৬ ভাগে ভাগ করে ৪ ঘণ্টা অন্তর খেতে বলা হয়। যদি এই ৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনো ব্যথা অনুভূত হয় তখন অতিরিক্ত একটা ডোজ় যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু যখন প্রায় প্রতিদিন দু-বারের বেশি অতিরিক্ত ডোজ়ের প্রয়োজন পড়ে তখন মরফিনের দৈনিক ডোজ়ের মাত্রা বাড়ানো দরকার। মরফিন ট্যাবলেট ছাড়াও ইঞ্জেকশন রূপে পাওয়া যায়। যাঁরা মুখে খেতে পারেন না, তাঁরা মরফিন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে পারেন। মরফিনের ওভারডোজ়ের ফলে ঝিমোনো ভাব, প্রিয়জনকে চিনতে না পারা, ভুল বকা, বমি, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, হ্যালুসিনেশন ইত্যাদি হতে পারে। সুতরাং এই ওষুধটি খুব সাবধানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। কখনো কখনো মরফিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সহ্যসীমা অতিক্রম করলে মরফিন জাতীয় অন্যান্য কিছু ওষুধ এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধগুলি ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশন বা ট্রান্সডার্মাল প্যাচ হিসাবে সহজলভ্য। এর মধ্যে ট্রান্সডার্মাল প্যাচটি ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধের—ওষুধ খাওয়ার ঝামেলা নেই, শরীরের রোমহীন কোনো স্থানে স্টিকারের মতো লাগিয়ে রাখলে একবারে তিন বা সাতদিন (ওষুধ-অনুযায়ী) ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, এই প্যাচ ব্যয়বহুল।

উপরোক্ত ওষুধগুলি ছাড়াও ব্যথা কমানোর আরও বিশেষ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন হাড়ে ক্যান্সার ছড়িয়ে-পরা ব্যথায় রেডিয়োথেরাপি অত্যন্ত উপযোগী। তাছাড়াও বিসফস্ফনেট জাতীয় কিছু ওষুধও ব্যবহার করা যেতে পারে যা হাড় ভেঙে যাওয়া প্রতিরোধেও সাহায্য করে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছু নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ব্যথা কমানোর জন্য বোন সিকিং আইসোটোপের (রেডিয়োঅ্যাকটিভ সামারিয়াম বা স্ট্রনশিয়াম) ব্যবহার। এগুলি ছাড়াও নার্ভ ব্লকের মাধ্যমেও ব্যথা কমানো যেতে পারে। বিশেষ করে যখন কোনো ওষুধেই ব্যথা কমানো যাচ্ছে না বা ওষুধের মাত্রাছাড়া পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় চিকিৎসাধীন ব্যক্তি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তখন এটি খুবই উপযোগী। এই প্রক্রিয়ায় অ্যানাস্থেটিক ইঞ্জেকশনের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্নায়ুগুলিকে অবশ করে ব্যথা কমানো হয়ে থাকে। অথবা টেন্স অর্থাৎ ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেক্ট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেশনের সাহায্যেও ব্যথা কমানো যেতে পারে।

এত কথার পর যে প্রশ্ন অবধারিত, সেটা হল, এ-দেশে এই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অবস্থা কী বা এই প্যালিয়েটিভ কেয়ার এই দেশ বা এই রাজ্যে মিলবে কোথায়।

এ-দেশে এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক মুম্বাই। সে শহরে, ১৯৮৬ সালে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের জন্ম 'শান্তি অবেদনা হসপাইস' হিসাবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এর আরও দু-টি শাখা দিল্লি এবং গোয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে কেরালাতে 'পেইন অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৯৪ সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার' প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরপরের কয়েক বছরে প্রচুর নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। যেমন—আসামে 'গুয়াহাটি পেইন অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি', চেন্নাইয়ে 'জীবদয়া হসপাইস', দিল্লিতে 'ক্যান সাপোর্ট', ব্যাঙ্গালোরে 'করুণাশ্রয় হসপাইস' এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

অনারোগ্য রোগীর ব্যথার উপশমের জন্যে অপরিহার্য হলেও, আজও আমাদের দেশে ওপিওয়েড বা আফিমজাতীয় ওষুধগুলি সহজলভ্য হতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হল ১৯৮৫ সালের 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস' বা 'এন ডি পি এস' বিলটি। এর ফলে ওষুধের দোকানগুলির পক্ষে মরফিন রাখা বড়ো সমস্যা। ফলস্বরূপ, দেখা যায়, ১৯৯৭ সালে ভারতে মাথাপিছু মরফিন ব্যবহারের হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই নীচে। ১৯৯৮ সালে 'এন ডি পি এস' বিলটি বদলানোর প্রস্তাব আনা হয় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই সংক্রান্ত ১৮টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছরে মরফিনের জোগান এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ারে এর ব্যবহারে কেরালা অভাবনীয় উন্নতি করে।

২০০৩ সালে 'প্যালিয়াম ইন্ডিয়া' নামক একটি সংস্থা প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে কেরালার বাইরের রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৪ সালে 'প্যালিয়াম ইন্ডিয়া' এবং কেরালা সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্যালিয়েটিভ কেয়ার পলিসিকে হেলথ কেয়ারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ভারতের অন্যান্য সব ক-টি রাজ্যের তুলনায় কেরালাতে অনেক বেশি প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট রয়েছে। ২০১০ সালে 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'-র দ্বারা প্যালিয়েটিভ মেডিসিন একটা ভিন্ন মেডিক্যাল স্পেশালিটি রূপে অনুমোদন পায় এবং ২০১২ সালে মুম্বাইয়ে 'টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল'-এ এম ডি কোর্সও চালু করা হয়।

যদিও শুরুর সময় থেকে ধরলে ভারতবর্ষে প্যালিয়েটিভ কেয়ার আন্দোলনে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে এখনও মাত্র এক শতাংশ ভারতীয়ের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছোতে পেরেছে। তবে আশার আলো এই যে বর্তমানে ভারতে ১৫০টিরও বেশি প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।

☞ কেরালাতে ৬০-এরও বেশি প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই রাজ্যের কালিকূট মডেলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেমনস্ট্রেশন প্রোজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করেছে।

☞ 'ক্যান সাপোর্ট' সংস্থাটির নিজস্ব ১১টি হোম কেয়ার টিম রয়েছে। প্রতি টিমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স এবং কাউন্সিলর থাকেন যাঁরা দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে পরিষেবা প্রদান করেন। এর পাশাপাশি এঁরা ডে কেয়ার সার্ভিসও প্রদান করেন।

☞ আসামে অবস্থিত 'গুয়াহাটি পেইন অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি'-তে তিনজন ডাক্তার, দু-জন নার্স ও তিরিশ জন স্বেচ্ছাসেবী সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আসামের তিনটি শহরে (রঙ্গিয়া, ডিগবয়, হোজাই) এর শাখা রয়েছে।

☞ ব্যাঙ্গালরে 'করুণাশ্রয়' একটি ৫৫ শয্যার হসপাইস। এই সংস্থা বাড়িতে বা নিকটবর্তী অন্য হাসপাতালে গিয়েও পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

☞ চণ্ডীগড়ে পি জি আই চণ্ডীগড়ের রেডিয়োথেরাপি বিভাগ ও 'ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি'-র চণ্ডীগড় শাখার যৌথ উদ্যোগে যে ইউনিটটি গড়ে উঠেছে তা চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন রোগীর বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি মোহালি ও পঞ্চকুলাতেও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

☞ 'কিদওয়াই মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ অঙ্কলজি' দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সার এবং অন্যান্য জটিল অসুখে আক্রান্ত রোগীদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করে আসছেন।

☞ দুর্ভাগ্য এটাই যে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশ খারাপ। এখানে এখনও হোম কেয়ার সার্ভিস প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ, অনারোগ্য রোগীর শেষ পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার। সেখানে, রোগীকে বাড়িতে রেখে পরিজনের মধ্যে রেখে তাঁর শুশ্রূষা না করা গেলে চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্যই পূরণ হয় না।

এই রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির বেশ কিছু ক্যান্সার বিভাগে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ক্লিনিক চালু আছে। বেশ কিছু মেডিক্যাল কলেজে চালু আছে আলাদা করে যন্ত্রণার উপশমের জন্যে পেইন ক্লিনিক। ব্যয়বহুল ট্রান্সডার্মাল প্যাচ এইসব জায়গায় পাওয়া যায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের নেতৃত্বে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রেডিয়োথেরাপি বিভাগে প্রতি বছরই আয়োজিত হয় একটি সার্টিফিকেট কোর্স, যেখানে চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মী, সবাই থাকতে পারেন। শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে ব্যথার চিকিৎসা বিষয়ে আলাদাভাবে ট্রেনিং-এরও বন্দোবস্ত আছে।

সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলি ছাড়া কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা যন্ত্রণা উপশমের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন—টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের উদ্যোগে 'প্রেমাশ্রয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট'; 'রুমা অবেদনা হসপাইস' ইত্যাদি। প্রায় সব বড়ো প্রাইভেট হাসপাতালেই আছে পেইন ক্লিনিক।

এসব সত্ত্বেও, আবারও মনে করিয়ে দেওয়া যাক, প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অর্থ অনারোগ্য মানুষের শুশ্রূষা। ডাক্তার বা সাধারণ মানুষ, দুইপক্ষের কাছেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার ভিন্ন চিন্তাধারা বা বিচারপদ্ধতি দাবি করে। ভিড় আউটডোরে রোগীর সামলানোর মধ্যে বা লাভজনক ব্যাবসার অন্যতম পথ হিসেবে প্যালিয়েটিভ কেয়ার হয় না। প্রচলিত আর সব চিকিৎসার থেকে এর দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদের রাজ্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে আর এবিষয়ে আমরা কেরালার মতো রাজ্য, যেখানে কিনা প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রায় একটি আন্দোলনের চেহারা নিতে পেরেছে, তাদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছি।

আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে এসে একটা কথা বলতে চাই যে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাঁর পছন্দ-অপছন্দই শেষ কথা। এর পাশাপাশি, পরিবার-পরিজনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার পাশাপাশি এইসব মানুষদের যত্ন এবং ভালোবাসারও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ আগেই বলেছি ব্যথা শুধুমাত্র একটা অনুভূতি নয়, এটা একটা শারীরিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা। আর আমাদের লক্ষ্য হল এই অসুস্থ, অশক্ত মানুষগুলোর বেঁচে থাকার শেষ দিনগুলিকে যতটা সম্ভব আনন্দময় করে তোলা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৌসুমী দাস, এমবিবিএস, এমডি (রেডিয়োথেরাপি), একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অঙ্কোলজি বিভাগে আরএমও পদে কর্মরতা।

ডিমেনশিয়া শুধুই স্মৃতিভ্রংশ নয়

ডা. অপূর্ব

ডিমেনশিয়া (Dementia) কথাটা আমরা আজকাল মোটামুটি সবাই স্মৃতিভ্রংশ বা স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করলেও আসলে কিন্তু স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া (Memory Loss) ডিমেনশিয়ার বহু উপসর্গের একটি মাত্র। ডিমেনশিয়া হয় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকার কারণে। উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে আমরা এই লেখায় ডিমেনশিয়া শব্দটিই ব্যবহার করব।

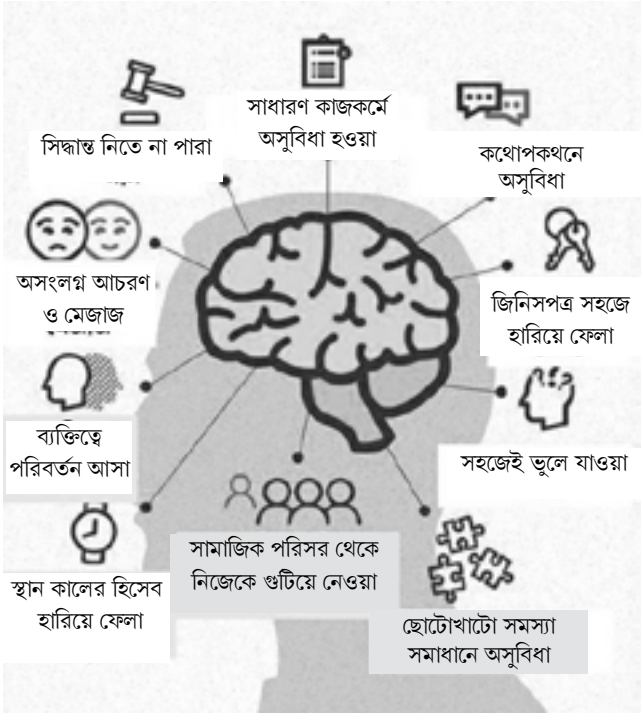

চিত্র ১. ডিমেনশিয়ার উপসর্গসমূহ

সাধারণত ৬০-৬৫ বছরের পর থেকে ডিমেনশিয়ার উপসর্গগুলি দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার ডিমেনশিয়া বার্ধ্যক্যের সমার্থক নয়, বার্ধ্যক্যের স্বাভাবিক পরিণতিতে ডিমেনশিয়া হবেই তা কিন্তু নয়। এখনকার হিসেব বলছে ৮০-র বেশি বয়স এমন মানুষদের প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জনের বয়সজনিত কারণে ডিমেনশিয়া (Senile Dementia) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক রোগ যেমন, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া, ডিসলিপিডেমিয়া (শরীরে ফ্যাটের অস্বাভাবিক বিপাকের ফলে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাটের পরিমাণের হেরফের ঘটা), মানসিক অবসাদ, বিশেষ কিছু ভিটামিন (যেমন B_{12})-এর অভাবে ডিমেনশিয়ার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ডিমেনশিয়া সারানো না গেলেও সময়মত রোগনির্ণয় হলে উপসর্গগুলির অগ্রগতি মন্থর করা যায় বা রোগের যে যে কারণগুলি দূর করা সম্ভব সেগুলি খুঁজে বার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ডিমেনশিয়াতে রোগীর কী কী সমস্যা হয়?

এই রোগে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কথা বলা, গভীর ভাবনাচিন্তা করা, নতুন জিনিস শেখা, বিভিন্ন আবেগের গভীরতা অনুভব করা, সুসংলগ্ন আচার-আচরণের ক্ষমতাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কোনো কাজে বেরিয়ে ভুলে যান কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন। লিখে লিখে মনে রাখতে চান, কিন্তু সেই লেখা কাগজগুলো কোথায় রেখেছেন মনে পড়ে না। ছোটোবেলার গল্প মনে থাকে, কিন্তু গতকাল রাতে কী খেয়েছেন তা ভুলে যান। দীর্ঘদিনের চেনা মানুষজনের নাম মনে করতে পারেন না। মস্তিষ্কের এমন বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুণ্ণ হয়ে সহজেই বাড়ির লোকজনের ওপর রাগারাগি করেন। সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। রোগ বেশি বেড়ে গেলে অমূলক ভ্রান্তি (Hallucination) ও মিথ্যামোহ (Delusion) দেখা দিতে পারে। শুরুতে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির লোকজন এসব বয়সকালের সমস্যা ভেবে তেমন গুরুত্ব দেন না। শেষে একটা সময়ে এসে রোগীর নিজের রোজকার কাজকর্মও সঠিকভাবে করে ওঠার ক্ষমতা চলে যায়। রোগী ক্রমশ অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। তাতে রোগী ও বাড়ির লোক উভয়েই পড়েন বিপদে। কাজেই নিজের বা আশেপাশের কারোর এরকম কিছু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে মনে করলে 'মনের ডাক্তার'-কে বলুন। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে ভয় পান অনেকেই। সাইকিয়াট্রিস্ট একমাত্র বদ্ধ উন্মাদের চিকিৎসা করেন না। শরীরের মতো মনেরও হাজার এক রকমের সমস্যা হতে পারে।

ডিমেনশিয়ার প্রথম দিকে রোগী অনেকসময় উপসর্গগুলি বুঝতে পারেন না বা অস্বীকার করেন। এরককম হলে সময় ও ধৈর্য নিয়ে রোগীর সঙ্গে কথা বলে রোগীর কাছে উপসর্গগুলি চিহ্নিত করানো প্রয়োজন। রোগীর নিজের রোগ সম্পর্কে ধারণা থাকলে চিকিৎসার অনেকটাই সুবিধা হয়।

কেন হয় ডিমেনশিয়া?

ডিমেনশিয়া একটি একক রোগ নয়, অন্য বিভিন্ন রোগের কারণে

বা পরিণতিতে ডিমেনশিয়া হতে পারে। তবে অনেকক্ষেত্রেই ডিমেনশিয়াতে মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক প্রোটিন, যা সাধারণভাবে জমা হওয়ার কথা নয়, সেগুলো জমা হতে দেখা গেছে। এই প্রোটিনগুলি জমা হওয়ার ফলে স্নায়ুকোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষমেশ মারা যায়। স্নায়ুকোষ একবার মরে গেলে আর চামড়া,নখ, চুলের মতো ফিরে তৈরি হয় না। তার জন্য এই ক্ষতি বরাবরের জন্য থেকে যায়। ডিমেনশিয়ার কারণ নিয়ে আমরা একটু গভীরে যেতে চাইব, অনেকের হয়তো বুঝতে সমস্যা হবে একটু। কিন্তু রোগীর ক্ষেত্রে এই রোগের সম্ভাব্য গতিধারা (Prognosis) বুঝতে গেলে একটু গভীরে না গেলে হবে না। আমরা ডিমেনশিয়ার সাধারণ উপস্থাপনগুলি (Presentation/রোগী যে যে উপসর্গ ও রোগলক্ষণ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন) নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

অ্যালঝাইমার্স ডিজ়িজ়

অ্যালঝাইমার্স ডিজ়িজ় ও ডিমেনশিয়া সমার্থক নয়। অ্যালঝাইমার্স ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ উপস্থাপন। অ্যালঝাইমার্স ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে। এই রোগে মস্তিষ্কে 'আমাইলয়েড' ও 'টাউ' প্রোটিন জমা হয়। কেন হয় তা আজও বিজ্ঞানীদের অজানা। এই প্রোটিনগুলি জমা হলে মস্তিষ্কের কোষগুলিতে স্নায়ুতরঙ্গ বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা যে করে সেই পদার্থ (যাকে বিজ্ঞানে অ্যাসিটাইলকোলিন বলে), তার অভাব দেখা দেয়। এই প্রোটিনগুলি জমা হতে না দেওয়ার কোনো উপায় এখনও নেই, কিন্তু ডোনেপেজিল জাতীয় কিছু ওষুধ অ্যাসিটাইলকোলিনের মাত্রা বাড়িয়ে উপসর্গ সাময়িকভাবে কিছুটা কমাতে পারে।

মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামে একটি অংশ থাকে যা সাম্প্রতিক সময়ের স্মৃতি সঞ্চয়ে মুখ্য ভূমিকা নেয়। অ্যালঝাইমার্স ডিজ়িজ়ে মস্তিষ্কের এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রোগীর হালফিলের স্মৃতি (Recent Memory) কমে যায়। নতুন জিনিস শেখার বা মনে রাখার ক্ষমতাও কমে যায়। এদের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই অনেকদিন আগেকার বা ছোটোবেলার স্মৃতি অটুট থাকে। এছাড়াও দেখা, নির্দেশ বুঝতে পারা ও কথা বলার জন্য মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা অংশ কাজ করে। সেই অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা কমে বা চলে যেতে পারে।

রক্তবাহের সমস্যাজনিত ডিমেনশিয়া (Vascular Dementia)

মস্তিষ্কে দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত না হলে এই ধরনের ডিমেনশিয়া হতে পারে। মস্তিষ্কের বহিস্তর বা কর্টেক্সের রক্তবাহগুলি খুব ছোটো হয়। দীর্ঘস্থায়ী উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বা ধূমপানের ফলে এই রক্তবাহগুলির গহ্বর ছোটো হয়ে গিয়ে রক্তপ্রবাহ ক্রমশ কমতে থাকে।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্তপ্রবাহে হঠাৎ বাধা সৃষ্টি (Stroke) হলেও ডিমেনশিয়া হতে পারে (Post Stroke Dementia)। তবে স্ট্রোক হলেই তারপর ডিমেনশিয়া হবে এমনটা নয়।

অনেকের ক্ষেত্রে অ্যালঝাইমার্স ও রক্তবাহজনিত ডিমেনশিয়া একসঙ্গে হতে পারে (Mixed Dementia)।

লিউয়ি বডি ডিমেনশিয়া (Lewy Body Dementia)

এই ধরনের ডিমেনশিয়াতে মস্তিষ্কে লিউয়ি বডি নামে একধরনের অস্বাভাবিক প্রোটিন জমা হয়। পারকিনসন্স ডিজ়িজ়ের মতো এই রোগেও হাত, পা কাঁপে, হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয় ও রোগীর পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

কমবয়সিদের কি ডিমেনশিয়া হতে পারে?

কমবয়সিদের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে কিছু কিছু জিনগত কারণে বার্ধক্যের অনেক আগেই কারও কারও মস্তিষ্কের সামনে আর দু-পাশে অস্বাভাবিক প্রোটিন জমা হতে পারে। (Fronto Temporal Dementia)।

এছাড়া আরও বেশ কিছু বিরলতর কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে, সেগুলি ডাক্তারবাবুদের জন্যে তোলা থাক।

ভুলে যাওয়া মানেই কি ডিমেনশিয়া?

সমস্ত ভুলে যাওয়ার উপসর্গই কিন্তু ডিমেনশিয়া নয়। এগুলিকে ডাক্তারি ভাষায় Mild Cognitive Impairment বলে। খুঁটিনাটি জিনিস মনে রাখতে না পারা, মনঃসংযোগে অসুবিধা হওয়া, পরিকল্পনা করা, ঘটনার যৌক্তিকতা বুঝতে না পারা, অনেকক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বা বেশ কিছু শারীরিক রোগে, যেমন অবসাদ, উদ্‌বেগ বা থাইরয়েডের রোগে, দেখা দিতে পারে। দায়ী রোগটির চিকিৎসা হলে অনেকক্ষেত্রেই এই উপসর্গগুলির প্রাবল্য কমে।

ডিমেনশিয়া এড়ানোর উপায় কী?

ডিমেনশিয়াকে এড়ানোর উপায় নিয়ে প্রচুর গবেষণা চললেও এখনও খুব সফল কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু কারণ (Risk Factors) খুঁজে পাওয়া গেছে যার কোনো কোনোটির প্রতিকার সম্ভব।

১. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু হবেই এমন কোনো কথা নেই। ডিমেনশিয়া বার্ধক্যের মতো ভবিতব্য নয়।

২. কানে শোনার ক্ষমতা চলে গেলে পারিপার্শ্বিককে জানা-বোঝার এক অন্যতম যন্ত্র হারিয়ে যায়। কানে শুনতে না পাওয়া ডিমেনশিয়ার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৩. মানসিক অবসাদ রোগ হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে উঠলে বা তার চিকিৎসা না হলে ডিমেনশিয়া শুরু হতে পারে।

৪. সামাজিক একাকীত্ব ও কর্মময় জীবনের অভাব ডিমেনশিয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

৫. ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে চর্বির পরিমাণ বেশি এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা

স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।

কীভাবে ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা করা হয়?

এখনও পর্যন্ত ডিমেনশিয়ার স্থায়ী কোনো প্রতিকার বা চিকিৎসা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কিছুদুর পর্যন্ত একে আটকানো সম্ভব।

আলঝাইমার্স ডিজ়িজ়ে মস্তিষ্কে অ্যাসিটাইলকোলিনের মাত্রা কমে যায়। কিছু কিছু ওষুধ মস্তিষ্কে আসিটাইলকোলিনের মাত্রা বাড়িয়ে কিছুটা উপকার দেয়। ডোনেপেজ়িল, রিভাস্টিগমিন, গ্যালানটামিন এই জাতীয় ওষুধ। যাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধে কাজ হয় না তাদের ক্ষেত্রে মেমান্টিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রোগে ডিমেনশিয়া হতে পারে, যেমন স্ট্রোক, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মেদাধিক্য, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ, মানসিক অবসাদ ইত্যাদির চিকিৎসা দরকার।

ডিমেনশিয়া অনেকটা এগিয়ে গেলে বেশ কিছু রোগী অশান্ত, বিরক্ত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। বিভ্রান্তি (Delusion) ও অলীক বিশ্বাস (Hallucination)-ও দেখা দিতে পারে। এই সময় রোগী ও রোগীর বাড়ির লোক উভয়েই বেশ ভালোরকম সমস্যায় পড়েন। এসব ক্ষেত্রে অনেকসময় রিসপেরিডোন জাতীয় ওষুধ সাইকায়াট্রিস্টরা ব্যবহার করেন।

ওষুধ ছাড়া আরও বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। রোগী অন্তত নিজের দৈনন্দিন কাজটুকু যাতে করে উঠতে পারেন, যাতে এই দীর্ঘ যাপিত জীবনের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে নেহাত স্থান-কাল-সময়বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষ সময়টা কাটাতে না হয় তার কিছুটা উপায় করা যায়। যেমন—

কগনিটিভ রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি: এতে দক্ষ সাইকোলজিস্ট ও রোগীর সবচেয়ে কাছের মানুষদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এই পদ্ধতিতে রোগীর সাথে বন্ধুর মতো মিশে রোজকার কাজে সাহায্য করা, একটু একটু করে ধরিয়ে দেওয়া, মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে শেখানো ইত্যাদি করা হয়। এছাড়া রোগীর সাথে পুরোনো দিনের গল্প করা, রোগীর অতীতের গল্প শোনা, সেসব নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা, আগ বাড়িয়ে শুনতে চাওয়া ও তার সাথে বর্তমানের যোগস্থাপন করতে করতে যাওয়া যেতে পারে। রোগীর পছন্দের সিনেমা দেখানো, গান শোনানো ইত্যাদিও এর অংশ। এতে রোগীর রোগ না কমুক, রোগী অন্তত মানসিকভাবে আনন্দে থাকতে পারেন ও একাকীত্বের বাড়তি বোঝা কিছুটা কমে, অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গেও লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। তবে রোগ অনেক এগিয়ে গিয়ে থাকলে এতে খুব উপকার হয় না।

ডিমেনশিয়া রোগনির্ণয় কীভাবে?

ডিমেনশিয়া রোগের ভালো করে ইতিহাস নিলে ও সাধারণ কিছু মৌখিক প্রশ্ন, বা লিখিত প্রশ্নাবলি থেকে রোগনির্ণয় করা যায়। জেনারেল ফিজিশিয়ান আপনার সাধারণ ও অন্যান্য যে যে কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে (যেমন থাইরয়েডের সমস্যা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ) সেগুলির চিকিৎসা করেন ও পরবর্তী পর্যায়ের চিকিৎসার জন্যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠান। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সময় শুধু রোগের ইতিহাস নিয়ে রোগনির্ণয় সম্ভব হয় না। সাইকায়াট্রিস্ট ও নিউরোলজিস্টরা কিছু কিছু মানসিক অবস্থা নির্ণয়ের পরীক্ষা (এর মাধ্যমে রোগীর তাৎক্ষণিক স্মৃতি, সাম্প্রতিক স্মৃতি, অতীত স্মৃতি, ভাষা ও সাধারণ আচার-ব্যবহার, স্থান, কাল, পাত্রের বোধ সঠিক আছে কিনা বোঝা যায়), মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান, ইইজি বা এমআরআই করাতে পারেন।

ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা নেই, কিন্তু ডিমেনশিয়া নিয়ে কীভাবে ভালো থাকা যায়?

ডিমেনশিয়ার কোনো চিকিৎসা নেই, তার মানে কিন্তু এটা নয় যে ডিমেনশিয়া হলে জীবনের সমস্ত আনন্দ শেষ। বিদেশে ডিমেনশিয়া রোগ নিয়ে সচেতনতা তৈরি, এ ধরনের রোগীদের জন্যে বিশেষ চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগীর কাছের মানুষদের কাউন্সেলিং করা, ট্রেনিং দেওয়া ইত্যাদি হরেকরকম ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে এরকম কিছু

ডিমেনশিয়া নিজে যতটা না সমস্যাজনক, রোগীর নিজের খুঁটিনাটি কাজের জন্যেও অন্যের ওপর নির্ভর হয়ে পড়াটা আরও বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

নেই বললেই চলে, থাকলেও সকলের জন্যে সমানভাবে নেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বেশ ভালো রকমের উপেক্ষিত। এর সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার সম্পর্ক সমানুপাতিক তো নয়ই, বরং দেখা গেছে উচ্চবিত্ত, আধুনিক, শহুরে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে এই সমস্যা বেশি প্রকট। ডিমেনশিয়ার সমস্যা যখন খুব বেশি এগিয়ে যায়, রোগী নিজের খেয়াল রাখতে, সময়মতো খাওয়াদাওয়া করতে, অন্যান্য সমস্যার জন্যে ওষুধপত্র ঠিকভাবে খেয়ে উঠতে পারেন না। ডিমেনশিয়া নিজে যতটা না সমস্যাজনক, রোগীর নিজের খুঁটিনাটি কাজের জন্যেও অন্যের ওপর নির্ভর হয়ে পড়াটা আরও বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

এন এইচ এস ডিমেনশিয়া রোগীদের যতদুর সম্ভব স্বাবলম্বী জীবনযাপন যাতে করতে পারেন তা নিয়ে খুবই সহজ কিছু উপরোধ রেখেছে। তার যেগুলি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সম্ভব সেগুলি উল্লেখ করা গেল।

১. লোকজনের সঙ্গে আরও বেশি বেশি করে মেলামেশা করুন, সময় কাটান, আড্ডা দিন, অন্যের জীবনের খবর রাখুন।

২. কাছের মানুষদের কাছে অ-যাচিত সেবা পাওয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা/অভিমান সরিয়ে রেখে তাঁদের বলুন তাঁরা আপনার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর তাঁরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন, দূরত্ব বজায় রাখলে আপনারই ক্ষতি।

৩. ডাইরি লেখার অভ্যাস রাখুন। লেখার কাজটি উদ্‌বায়ী স্মৃতিকে কিছুটা হলেও কাঠামো দেয়। কাজের তালিকা বানিয়ে চলা যেতে পারে।

৪. কাছের মানুষদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার কাছে রাখুন।

৫. বইখাতা, ফাইল, কৌটো, ওষুধের শিশি, প্যাকেটের উপর নাম বা নির্দেশ লিখে রাখুন।

৬. আপনার পছন্দের কাজ বা হবিতে সময় দিন। পড়ানোর অভ্যেস থাকলে বাচ্চাদের পড়াতে পারেন, আঁকা শেখানো, বাগান করা, গাছ লাগানোয় সময় দিতে পারেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে উদ্যমী থাকতে হয় এরকম কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সমস্যা কম হয় এবং চিকিৎসাতেও বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়।

৭. উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস থাকলে অবহেলা না করে চিকিৎসা করান। ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে, কমান।

রোগীর কাছের মানুষরা কী করতে পারেন?

ডিমেনশিয়াতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর খুব সাধারণ জিনিস মনে রাখার ক্ষমতাও চলে যায়। নাম, তারিখ, জায়গার নাম মনে থাকে না। ফলে রোগীর সাথে কথোপকথন চালানোও আস্তে আস্তে কঠিন হতে থাকে। রোগীর সাধারণ কাজকর্ম, স্নান করানো, খাবার খাওয়ানো, পায়খানা, পেচ্ছাপ করানো থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ বাড়ির লোকজনদের করিয়ে দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির লোকেরা আর পেরে না উঠে বিরক্ত হন, বা রোগীকে আরও আলাদা করে রাখা শুরু করেন। বাড়ির লোকেরা যা যা করতে পারেন:

১. রোগীর সাথে কথা বলুন, কথা বলতে উৎসাহিত করুন।

২. উচ্চৈস্বরে আদেশ না করে ছোটো ছোটো, স্পষ্ট উচ্চারণে, সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলুন বা নির্দেশ দিন বা প্রশ্ন করুন। না পারলে কোনোরকমভাবেই শাস্তি দেবেন না। খারাপ বা অবমাননাকর কথা বলবেন না।

৩. রোগীর ছোটো ছোটো পরিকল্পনা শুনুন, বিস্তারিত করতে সাহায্য করুন। ভুল হলে সহজ ভাষায় ধরিয়ে দিন।

৪. রোগীর শরীরস্বাস্থ্য, মনের অবস্থা নিয়ে রোগীর নিজের মতামত জানতে চান। খাবার ভালো লাগছে কিনা, স্নানের জল ঠিকমতো গরম হয়েছে কিনা, বিকালে জলখাবারে কী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—এসব জিজ্ঞেস করুন। দ্বিমুখী সক্রিয় কথোপকথন সাম্প্রতিক ও সাধারণ কাজকর্মের স্মৃতি সহজে লোপ পেতে দেয় না।

৫. রোগীর সাথে কথা বলার সময় সিদ্ধান্ত না জানিয়ে রোগীর মতামত জানতে চান।

৬. কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। রোগী কিছু বলছেন এমন সময় বাধা দেবেন না। চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বা বাংলা সিরিয়ালের মতো কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থেকে রোগীর সাথে কথা বলবেন না। রোগীর কথার উত্তরে কথার সাথে মাথা নেড়েও সায় দিন বা না বলুন।

৭. দায়িত্ব এড়াতে টিভি, রেডিও চালিয়ে তার সামনে রোগীকে বসিয়ে রেখে দেবেন না। এতে রোগীর ক্ষতিই হবে।

সাম্প্রতিক সময়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার এক অন্যতম বিষয় হিসাবে ডিমেনশিয়া থেকেছে। স্টেমসেল ব্যবহার করে নষ্ট হয়ে যাওয়া স্নায়ুকোষ ফিরে তৈরি করা, বা জমে যাওয়া অস্বাভাবিক প্রোটিনের বিরুদ্ধে ক্লোন করা অ্যান্টিবডির ব্যবহার করে রোগের দ্রুতি কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে খুব বেশি সাফল্য এখনও পাওয়া যায়নি। গেলেও সাধারণ মানুষ যে তার সুবিধা পাবেন না সে বলাই বাহুল্য। কাজেই ভালো থাকতে চান তো আগে থাকতে উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান ও স্থূলতা এই চার শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখুন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

সুমন্ত বিশ্বাস, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), রথীন-দা (গোলপার্ক)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

ফোন-৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

হাম

হাম হল ভাইরাসঘটিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে এক অসুখ। এটা বেশ ভোগায়, আর এর থেকে খুব মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশে হামের টিকা চালু হবার পর এর প্রকোপ খানিক কমেছে, কিন্তু তা নির্মূল হয়নি, লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

হাম বাচ্চাদেরই বেশি হয়, তবে টিকা দেওয়া হয়নি ও জীবনে কখনো হাম হয়নি, এমন যেকোনো মানুষেরই এই রোগ হতে পারে। সাধারণত সাত থেকে দশদিনের মধ্যে এই রোগ সেরে যায়।

হামের লক্ষণ

জীবাণু শরীরে ঢোকার দিন দশেক পরে হামের লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণগুলো হল:

➢ ঠান্ডা লাগার মতো অবস্থা, যেমন নাক দিয়ে সর্দিজল ঝরা, হাঁচি ও কাশি।

➢ লাল চোখ ও চোখ জ্বালা, একটু জোরালো আলোতে চোখ কড়কড় করা, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া।

➢ জ্বর, যা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত উঠতে পারে।

➢ গায়ে ব্যথা, অখিদে, ক্লান্তি, বিরক্তি বা খিটখিটে মেজাজ।

➢ মুখের ভেতরে গালে ছোটো হালকা ছাই রঙের ছোপ। এটা সবার হয় না, কিন্তু এটা হলে তাই দেখে র‍্যাশ বেরোবার আগেই ডাক্তাররা অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারেন, হাম হয়েছে। গায়ের 'র‍্যাশ' বেরোনোর এক-দু-দিন আগেই এটা বেরোয়, আর দু-তিনদিনে মিলিয়ে যায়।

➢ এরপর, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ শুরু হবার দিন-চারেক পরে, গায়ে লালচে র‍্যাশ বেরোয়। সাধারণত মাথা বা গলার ওপরদিকে শুরু হয়ে তা শরীরের অন্যত্র ছড়ায়। র‍্যাশ মিলিয়ে যেতে দিন সাতেক সময় লাগে।

র‍্যাশ বেরোনোর প্রথম বা দ্বিতীয় দিন হল সবথেকে কষ্টের দিন।

হামের র‍্যাশ কী করে চিনবেন?

ডাক্তাররাও সবসময় হামের র‍্যাশ পুরো নিশ্চয়তা দিয়ে ধরতে পারেন না। কিন্তু কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থাকলে হাম হয়েছে বলে সন্দেহ প্রবল হয়।

☞ খুদে খুদে লালচে-বাদামি, গায়ের সঙ্গে মেশা বা সামান্য একটু উঁচু (অর্থাৎ হাতে উঁচু পেতেও পারেন, নাও পারেন) ছোপ দাগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্যটার সঙ্গে মিশে বড়ো লালচে এলাকা তৈরি করে।

☞ সাধারণত মাথা-মুখ বা গলার ওপরদিকে শুরু হয়ে নীচের দিকে ছড়ায়।

☞ কারও কারও সামান্য চুলকানি থাকতে পারে।

☞ ছোটোবেলার অন্য কিছু ভাইরাস-ঘটিত র‍্যাশের সঙ্গে অনেকটা একরকম, কিন্তু ডাক্তাররা অধিকাংশ সময় আলাদা করতে পারেন।

☞ হামের পুরো টিকাকরণ হয়ে থাকলে বা আগে কোনোসময় হাম হয়ে থাকলে, হাম না হবার সম্ভাবনা প্রবল।

☞ আমাদের দেশে হাম ও জলবসন্তকে বাড়ির লোকেরা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন। সেটা হবার কারণ নেই। মনে রাখবেন, জলবসন্তে গোটা হয়, সেই গোটায় জল বা পুঁজ থাকে। হামে এমন গোটা কখনোই হয় না।

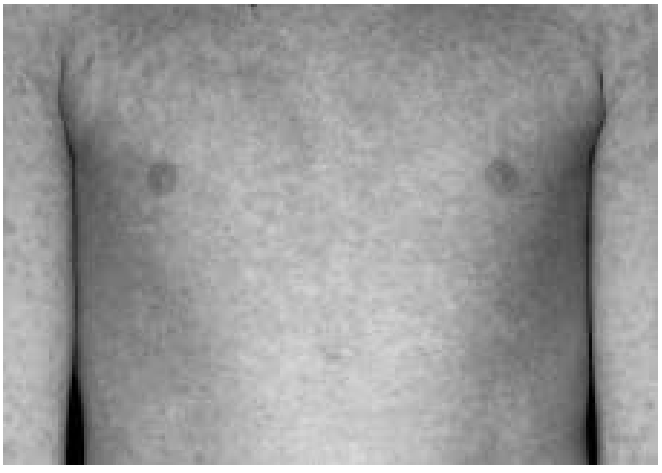

চিত্র ১. ফর্সা চামড়ায় হামের র‍্যাশ বেশি সহজে বোঝা যায়, ও তা দেখতে এরকম লাগে

কখন ডাক্তার ডাকবেন?

হাম হয়েছে এমন ভাবলে তখনই ডাক্তার ডাকবেন। এছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে বলা হয় যে যদি জীবনেও হাম না হয়ে থাকে ও হামের টিকা পুরো দেওয়া না থাকে, তাহলে হামের রোগীর কাছাকাছি এলে ডাক্তার দেখাতে হবে। আমাদের দেশে এটা সব ক্ষেত্রে করা হয় না।

হাম কতটা ভয়ানক?

এই রোগ কষ্টদায়ক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত-দশদিনের মধ্যে সেরে যায়, আর কোনো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি থাকে না। একবার হাম হলে শরীরে হামের বীজাণু যে ভাইরাস তার বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনে দ্বিতীয়বার হাম হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

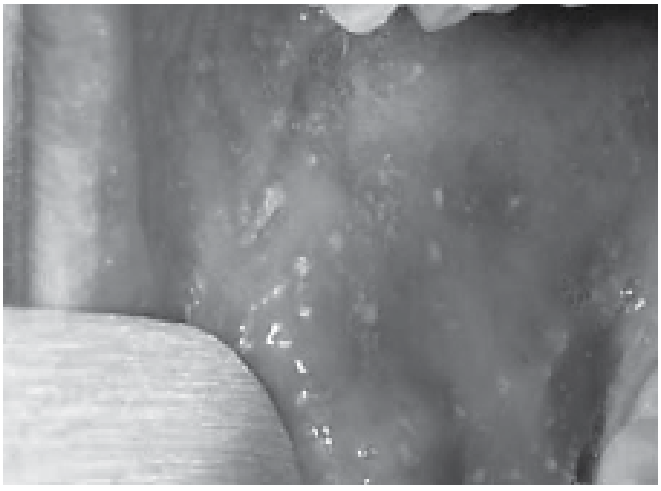

চিত্র ২. মুখের ভেতরে গালে ছোটো হালকা ছাই রঙের ছোপ।

কিন্তু কারও কারও খুব বড়ো ধরনের জটিলতা হতে পারে, মৃত্যু সম্ভাবনাও হতে পারে। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ফুসফুসের সংক্রমণ (নিউমোনিয়া) ও মস্তিষ্কের সংক্রমণ (এনকেফেলাইটিস)।

উন্নত দেশে হাম হলে প্রতি পাঁচহাজার জনে একজন মারা যায়। কিন্তু সবার এরকম জটিলতা বা মৃত্যু-সম্ভাবনা এক নয়।

কাদের হামজনিত জটিলতা বা মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি?

- একবছরের নীচে বাচ্চাদের।
- খেতে-না-পাওয়া অপুষ্ট শিশুদের।
- যেসব বাচ্চাদের অন্য কোনো কারণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে (যেমন লিউকেমিয়া রোগীদের)।
- বাচ্চাদের তুলনায়, কৈশোর ও তার চেয়ে বেশি বয়সে রোগ হলে ঝুঁকি বেশি।

একবছর থেকে বছর বারো পর্যন্ত বয়সি সুস্থ বাচ্চাদের রোগ থেকে মারাত্মক কিছু হবার ঝুঁকি কম।

হামের সাধারণ কিছু জটিলতা

এগুলো হল:

- পাতলা পায়খানা ও বমি, যা থেকে শরীরে জলাভাব ঘটতে পারে।
- কানের ভেতর সংক্রমণ, যা থেকে কানে ব্যথা হয়।
- গলায় (স্বরযন্ত্রে) প্রদাহ, গলাব্যথার কারণ।
- চোখের সংক্রমণ বা কনজাংটিভাইটিস।
- নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস হবার জন্য কষ্টকর কাশি।
- জ্বর-জনিত তড়কা বা খিঁচুনি।

পনেরো জনে একজন হামের রোগীর এরকম কিছু জটিলতা হতে পারে।

হামের বিরল কিছু জটিলতা

এগুলো হল:

- লিভার (যকৃৎ) সংক্রমণ (হেপাটাইটিস)।
- চোখের দৃষ্টিতে ট্যারাভাব এসে যাওয়া, যা চোখের স্নায়ু ও পেশিতে ভাইরাস সংক্রমণের জন্য ঘটে।
- মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের চারিদিকে যে পর্দা থাকে তার সংক্রমণ (মেনিনজাইটিস), এমনকী মস্তিষ্কের সংক্রমণ (এনকেফেলাইটিস)।

আরও বিরল হল:

- চোখের বড়ো রোগ, যেমন চোখের স্নায়ুর সংক্রমণ—এতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে পারে, এমনকী অন্ধত্বও হতে পারে।
- হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা যা স্থায়ী হতে পারে।
- মস্তিষ্কের প্রাণঘাতী অসুখ—খুব বিরল, পঁচিশ হাজার হামরোগীর মধ্যে একজনের হয়, আর হাম সেরে যাবার কয়েক বছর পরেও শুরু হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় হাম

গর্ভাবস্থায় হাম হলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি:

- ভ্রূণ নষ্ট, অথবা মৃত সন্তান প্রসব।
- সময়ের আগে বাচ্চা জন্মানো।
- বাচ্চার জন্মকালীন ওজন কম হওয়া।

তাই গর্ভাবস্থায় হামরোগীর সংস্পর্শে এলে, আগে যদি টিকা না নেওয়া থাকে বা আগে হাম যদি হয়ে না থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে

হাম হলে সেটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা দেখার দায়িত্ব রোগীদেরও। র‍্যাশ বেরোনোর পর চারদিন স্কুল বা অন্যত্র যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ছোটো বাচ্চা ও গর্ভবতী মায়েদের সংস্পর্শে তাদের যাওয়াই উচিত নয় ।

ডাক্তার দেখানো উচিত। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা করলে হাম হবার সম্ভাবনা কমে, ফলে বাচ্চার ঝুঁকি কমে।

হাম হলে কখন জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তার ডাকবেন?

- নিশ্বাসে কষ্ট
- বুকে ব্যথা, যা শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বাড়ে
- কাশির সঙ্গে রক্ত
- ঝিমুনি
- এলোমেলো বকা, বা সাধারণ বুদ্ধিলোপ
- খিঁচুনি

এগুলো হলে বুঝতে হবে খুব সম্ভব হামের সঙ্গে অন্য জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া) সংক্রমণ হয়েছে, আর হাসপাতালে ভর্তি করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

হাম কী করে ছড়ায়?

হাঁচি বা কাশির সঙ্গে যে ক্ষুদ্র জলকণা বেরিয়ে আসে তাতে অজস্র হামের ভাইরাস থাকে। সেটা সরাসরি অন্যের শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে, বা কোথাও গিয়ে লাগতে পারে। সেখান থেকে হাত দিয়ে তা অন্যের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে।

প্রথম লক্ষণ শুরু হবার পর থেকে র‍্যাশ বেরোনোর চারদিন পর পর্যন্ত একজন রোগীর শরীর থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

হাম প্রতিরোধের উপায় কী?

হামের টিকা: হাম আটকানোর উপায় হল যথাসময়ে টিকা দেওয়া। আমাদের দেশে জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে হাম ও রুবেলা (জার্মান হাম)-এর টিকা একসঙ্গে দেওয়া হয়—একে বলে এমআর ভ্যাক্সিন।

হামের কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই। সাত-দশদিনের মধ্যে এই রোগ নিজেই সেরে যায়। . . . অন্তত চারদিন স্কুল বা অফিস ইত্যাদি কামাই করতে হবে। আর কষ্ট থাকুক বা না থাকুক, প্রচুর জল, সরবত ইত্যাদি খেতে হবে।

জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি অনুসারে, এই দুটো টিকার প্রথম ডোজ় ৯-১২ মাস বয়সে, ও দ্বিতীয় (শেষ) টিকার ডোজ় ১৬- ২৪ মাস বয়সে দেবার কথা। তবু সঠিক সময়ে কোনো শিশুর এই টিকাকরণ না হয়ে থাকলে, এবং তার যদি এই রোগ দুটো না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম ডোজ়টি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত দেওয়া যায়, এমন বলা হয়েছে। এটা বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন, কেননা আমাদের দেশে টিকাকরণ সবার কাছে সময়ে পৌঁছোয় না।

ভারতীয় শিশুচিকিৎসকদের সংগঠন (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পিডিয়াট্রিশিয়ান্স) অবশ্য একসঙ্গে হাম, মাম্পস, ও রুবেলা (জার্মান হাম)-এর টিকা দিতে বলছেন—একে বলে এমএমআর টিকাকরণ। তার প্রথম ডোজ় ৯ মাস পূর্ণ হবার পরেই, ও দ্বিতীয় ডোজ় ১৬ মাস বয়সে দিতে বলছেন। উন্নত দেশে, যেমন ব্রিটেনে, এর থেকে একটু বেশি বয়সে এমএমআর টিকা দিতে বলা হয়।

বলা প্রয়োজন, আগের টিকাকরণের কাগজ যদি হারিয়ে যায় ও টিকাকরণ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে টিকা দিয়ে দেওয়াই ভালো। দু-বার টিকা দিলে তেমন ক্ষতি কিছু নেই। এছাড়াও ব্রিটেনে নিয়ম হল যে, যদি স্থানীয়ভাবে হামের প্রাদুর্ভাব ঘটে, বা কোনো হামরোগীর সংস্পর্শে আসার ইতিহাস থাকে, বা হামের খুব প্রাদুর্ভাব আছে এমন জায়গায় যদি যেতে হয়, তাহলে ছ-মাসের চেয়ে বড়ো সবারই এমএমআর টিকা নিয়ে নেওয়া উচিত।

হিউম্যান নরম্যাল ইমিউনোগ্লোবিউলিন: ছ-মাসের নীচে বাচ্চার, গর্ভবতী মায়েদের ও রোগ-প্রতিরোধে ঘাটতি আছে এমন মানুষের (যেমন এইচআইভি পজিটিভ মানুষদের) যদি আগে টিকা দেওয়া না থাকে ও হাম অতীতে না হয়ে থাকে, তাহলে হামরোগীর সংস্পর্শে এলে টিকা ছাড়া অন্য প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দেওয়া দরকার। এই চিকিৎসা হল হিউম্যান নরম্যাল ইমিউনোগ্লোবিউলিন। এটা ব্যয়সাধ্য, হামরোগীর সংস্পর্শে আসার ছ-দিনের মধ্যে দিতে হয়। খুব তাড়াতাড়ি এটা শরীরে হামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে, কিন্তু সে প্রতিরোধ স্থায়ী হয় না।

হাম হলে সেটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা দেখার দায়িত্ব রোগীদেরও। র‍্যাশ বেরোনোর পর চারদিন স্কুল বা অন্যত্র যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ছোটো বাচ্চা ও গর্ভবতী মায়েদের সংস্পর্শে তাদের যাওয়াই উচিত নয় ।

হামের চিকিৎসা

হামের কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই। সাত-দশদিনের মধ্যে এই রোগ নিজেই সেরে যায়। আপনার চিকিৎসক এ-রোগের অবস্থা বিচার করতে পারবেন, ও কষ্ট কমানোর ওষুধ দিতে পারবেন। অন্তত চারদিন স্কুল বা অফিস ইত্যাদি কামাই করতে হবে। আর কষ্ট থাকুক বা না থাকুক, প্রচুর জল, সরবত ইত্যাদি খেতে হবে।

রোগের কষ্ট বলতে মূলত জ্বর, গায়ে ব্যথা ও র‍্যাশ। জ্বর ও গায়ে ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল যথেষ্ট। আপনার ডাক্তার দরকার বুঝলে আইবুপ্রোফেন বা ওরকম কিছু দিতে পারেন।

চোখ লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, ব্যথা হওয়া—এসবের জন্য পরিষ্কার তুলো পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে চোখের পাতা ও রোঁয়া পরিষ্কার করতে হবে।

সর্দি-কাশি হলে বন্ধ ঘরে গরম জলের ভাপ দেওয়া যেতে পারে বা গরম তোয়ালে ভাপ-ওঠা ভিজে দিয়ে নাকমুখ মোছানো যেতে পারে। গরম পানীয় খেলে ভালো লাগে, বিশেষ করে গরম জল-মেশানো মধু-লেবু। তবে একবছরের নীচে মধু খাওয়াতে বারণ করা হয়, শুধু লেবু চলতে পারে।

হামের জটিলতা কী কী, ও কী দেখলে তা সন্দেহ করা উচিত সে ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে। তাই চিকিৎসার পাশাপাশি, কোনো জটিলতা তৈরি হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বা ধমনিতে চড়া পড়া

ধমনির দেওয়ালে চর্বিজাতীয় উপাদান জমা হওয়া অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, যা আবার হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর রোগের প্রধান কারণ। NHS-এর রোগীদের জন্য প্রচারিত সামগ্রী থেকে সহায়তা নিয়ে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নিয়ে লিখছেন **ডা. অনিন্দিতা দাস**।

সকল পাঠককে ইংরাজি নয়া বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এবারের সংখ্যায় আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেছে নিচ্ছি 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস'-কে। কিন্তু নামটির বহর দেখেই যাতে পাঠককুল অসহিষ্ণু হয়ে না পড়েন তাই বলি, 'নামে নয় আসল পরিচয় কিন্তু কামে অর্থাৎ কাজে।'

আমরা অনেকেই জানি এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ যে রোগে, সেটি হল হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর রোগ। এবং আশঙ্কার কথা হল, ডাক্তারি বিভিন্ন সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০২০ সালের মধ্যে এই হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর রোগ ও তার থেকে মৃত্যুর প্রধান ও মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। তাহলেই বুঝুন কেমন করিতকর্মা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস।

তাই চলুন একটু চেনাশোনা করে নেওয়া যাক অ্যাথেরো-স্ক্লেরোসিসের সঙ্গে।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কী ও কেন?

ছেলেবেলায় জীবনবিজ্ঞানে মানবদেহের সংবহনতন্ত্র পড়ার সময় আমরা জেনেছি, সংবহনতন্ত্রের মূলে আছে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালী বা রক্তবাহ। রক্তনালীগুলি আবার তিন প্রকার—শিরা, ধমনি ও রক্তজালিকা। এর মধ্যে ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন ও দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে (ব্যতিক্রম ফুসফুসীয় ধমনি)। এ হেন কর্মঠ ধমনির রোগ হল অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস।

ধমনির দেওয়ালে রক্তের অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় উপাদানসমূহ জমা হয়ে প্লেক বা অ্যাথেরোমার সৃষ্টি করে, এই প্রক্রিয়াকেই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বলা হয়। এর ফলে ধমনির স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় ফলে রক্তনালীর স্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণের মাত্রা কমে যায় এবং নালীর স্বাভাবিক পরিধি কমে গিয়ে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়, ফলে কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শ্বসনকার্যে অসুবিধা হয়। অন্যদিকে রক্তনালীতে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যায় তার ফলে তঞ্চিত রক্তপিণ্ড রক্তনালীতে আটকে রক্তনালীতে রক্ত চলাচলের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে কোষ-কলার স্থায়ী মৃত্যু হতে পারে।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে কী কী হতে পারে?

শরীরের মূল একক কোষ। কোষের বেঁচে থাকার রসদ রক্ত। আর সেই রসদের বাহক ধমনি। ধমনি অসুস্থ মানে কোষে রক্ত পৌঁছানোর কাজে ব্যাঘাত, ফলে কোষও অসুস্থ এবং অসুস্থতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে কোষের মৃত্যু অনিবার্য।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে শরীরের যে যে অঙ্গের ক্ষতিসাধন হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড।

✦ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infarction) ও অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস—হৃৎপিণ্ডের কোষে রক্তসরবরাহকারী

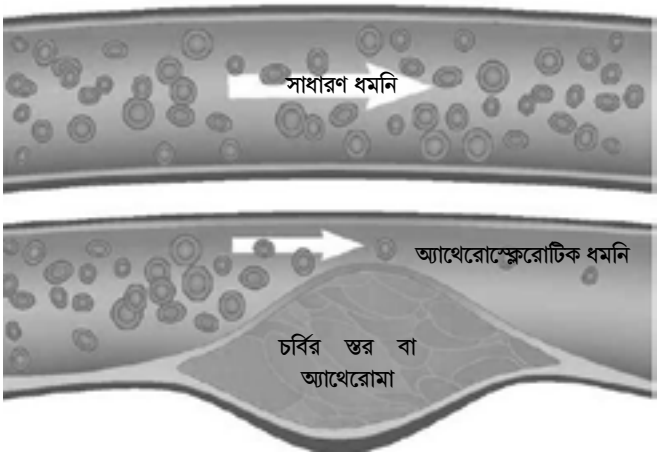

চিত্র ১. স্বাভাবিক ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ধমনি

করোনারি ধমনির অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে হৃৎপিণ্ডের কোষের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে ব্যাঘাত, হৃৎপিণ্ডের কোষের মৃত্যু এবং বুকের ব্যথার সূত্রপাত অর্থাৎ যা আমরা সচরাচর চিনি হার্ট অ্যাটাক বলে।

✦ সেরিব্রাল স্ট্রোক—মস্তিষ্কের কোষে রক্তবহনকারী ধমনির অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়ে মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যু হয়। শরীরের একদিকের অংশের দুর্বলতা, মুখ বেঁকে যাওয়া ও কথা জড়িয়ে আসা, যা আমরা সচরাচর চিনি স্ট্রোক বলে।

✦ হাতে পায়ে রক্তবহনকারী ধমনির অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে রক্তসংবহন ব্যাহত হয়ে হাত-পা-এ অসাড় ভাব ও যন্ত্রণা হতে পারে।

✦ ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ, যার ফলে হৃৎপিণ্ডের কোষে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, কিন্তু কোষের স্থায়ী মৃত্যু হয় না।

✦ ট্রানজিয়েন্ট ইসচেমিক স্ট্রোক, যার ফলে মস্তিষ্কে সাময়িক রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের প্রক্রিয়া কোনো মানুষের দেহে শুরু হওয়ার পর তা থেকে উদ্ভূত হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক-এর মতো প্রাণঘাতী অবস্থা তৈরি হতে প্রায় ১০ বছর বা তার থেকে বেশি সময় লাগে। তাই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসকে প্রাথমিক স্তরে ধরার জন্য, কোন কোন প্রভাবের জন্য মানুষের শরীরে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে তা জানা ও সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায়ে এই মুহূর্তে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

কাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি?

- বয়স বাড়লে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
- বংশে কারোর হৃৎসংবহনজনিত রোগের ইতিহাস থাকলে।
- উচ্চরক্তচাপ—সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৫০ মিমি পারদ ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিমি পারদের বেশি হলে।
- মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস—রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা খালি পেটে অর্থাৎ FBS (fasting blood glucose) প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ১২৬ মিগ্রা বা তার বেশি এবং ভরা পেটে অর্থাৎ PPBS (Post prandial glucose) প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ২০০ মিগ্রা বা তার বেশি হলে।
- হাইপারলিপিডেমিয়া—রক্তে চর্বি বা লিপিডের মাত্রা বেশি হলে। মূলত ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল ও এলডিএল-এর রক্তে মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি, অন্যদিকে এইচডিএল-এর রক্তে স্বাভাবিকের তুলনায় কম উপস্থিতি।
- ওবেসিটি—দেহের ওজন বেশি হলে, B.M.I. ২৫-এর চেয়ে বেশি হলে।
- ধূমপান ও অন্য কোনো উপায়ে তামাক গ্রহণ করলে।
- মদ বা অ্যালকোহল পান করলে।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করার উপায়

- খাবারদাবার—চর্বিযুক্ত খাবার কম খেতে হবে, তেলেভাজা-জাতীয় খাবার বর্জন করতে হবে।
- ব্যায়াম—সাইকেল চালানো, সাঁতার, দৌড়ানো, জোরে হাঁটার মতো শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়াম করতে হবে প্রতিদিন।
- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাইপারলিপিডেমিয়ার মতো আনুষঙ্গিক রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের চিকিৎসা

আমরা আগেই জেনেছি ধমনির দেওয়ালে প্লেক বা অ্যাথেরোমা সৃষ্টির মূলে আছে রক্তের অতিরিক্ত লিপিড, মূলত রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় এলডিএল ও কোলেস্টেরলের উপস্থিতি। তাই স্ট্যাটিন গোত্রের ওষুধ (যেমন অ্যাটরভাস্ট্যাটিন) দিয়ে চিকিৎসা করা হয় যাতে রক্তের

অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক বা ডায়াবেটিস কিংবা হাঁচি কাশি প্রতিটি রোগেরই কিছু প্রতিরোধমূলক সচেতন পদক্ষেপ থাকে,যেমন তামাক বর্জন করা, দেহের অতিরিক্ত মেদ কমানো, নিয়মিত হাঁটাচলা, দৌড়ানো—যার মাধ্যমে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকিকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি।

কোলেস্টেরল ও এলডিএল-এর পরিমাণ কমে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ত তরল রাখতে সাহায্য করে এরকম ওষুধ যেমন অ্যাস্পিরিন ব্যবহার করা হয়, এর ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ফলে সৃষ্ট জমাট রক্তের পিণ্ড-এর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে রক্তসংবহনকারী ধমনি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কমে ও মস্তিষ্কের ধমনিগুলো বন্ধ হয়ে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

কখনো কখনো প্রয়োজনে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির মতো কিছু শল্য-চিকিৎসা পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয় ব্যক্তিবিশেষে।

শেষ করার আগে কয়েকটি কথাই বলব অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হোক বা ডায়াবেটিস কিংবা হাঁচি কাশি প্রতিটি রোগেরই কিছু প্রতিরোধমূলক সচেতন পদক্ষেপ থাকে, সেগুলো জানানোর দায় যেমন চিকিৎসকের তেমনি সেগুলোকে মেনে চলার দায় কিন্তু রুগীর। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে যেমন তামাক বর্জন করা, দেহের অতিরিক্ত মেদ কমানো, নিয়মিত হাঁটাচলা, দৌড়ানো—যার মাধ্যমে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকিকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা দাস, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসা শিবিরে যুক্ত।

মন নিয়ে কথকতা

ডা. স্বস্তিশোভন চৌধুরী

প্রথম পর্ব

মনটা একটু খিটকেল হয়ে আছে তো?? সেই ভালো। মন্দের ভালো। ভালোর ভালো তো কিছু হয় না। (শিব্রাম উবাচ)

আমি পেশায় একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সম্ভবত, বিশেষ ভাবে অজ্ঞ। কারণ আমার নিজের মনটাকেই তো ভালো বশে আনতে পারি না। কেউ কি পারে??

আমাদের একটা চলতি নাম আছে, 'পাগলের ডাক্তার'। আমজনতার কাছে তো বটেই, বহু চিকিৎসক বন্ধুর কাছেও। আর 'শা . . ., পাগলের ডাক্তার, পাগল', এমন কথাও যে শুনতে হয়নি বা হয় না, তাও নয়। কিন্তু আমাদের অভিধানে এই 'পাগল' কথাটাই একটা নিষিদ্ধ শব্দ। যতক্ষণ না একজন মানুষকে তার সমস্ত রকম অস্বাভাবিক আচরণ সত্ত্বেও একজন মানুষের স্বীকৃতি না দিতে পারছি, ততক্ষণ চিকিৎসার প্রাথমিক ধাপেই হোঁচট খেতে হবে। আমি এটুকু জানি, যে কী ওষুধ প্রয়োগ করলে এই মানুষটির অস্বাভাবিক আচরণের খানিক নিবৃত্তি ঘটবে, কিন্তু তার আগে তাকে একজন অসুস্থ 'মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করাটা বেশি জরুরি।

যখন এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি, তখন পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, মলয়-দা [প্রফেসর (ডা.) মলয় ঘোষাল] প্রথমেই যেটা বলেছিলেন সেটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কথা। 'মন', আচরণ'— এইসব বিষয় নানাদিকে ছড়িয়ে আছে, 'Abstract' ভীষণ, একে একটা সীমার মধ্যে বাঁধাটাই চিকিৎসক হিসেবে আমাদের কাজ, আমাদের চ্যালেঞ্জ। তাই বলে অসীমের খোঁজ নিতে হবে না তা নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মনোজগতের বিষম আচরণের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সেগুলোর ছন্দেই 'সীমা'-কে চিহ্নিত করতে হবে। যেন কবিগুরুর বাণী, "সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর. . ."

যাক, অনেক আদ্যোপান্ত, ইতিবৃত্তান্তের চরকা কাটা হল। আসলে কাজটা হল মনকে নিয়ে। তা, মনটা আসলে কী? শরীরের কোথায় তার অবস্থান? সত্যি কি সে আছে, নাকি বায়বীয়? এসব নানা প্রশ্নের উত্তরে নানা "হুঁ" "হাঁ" জাতীয় উত্তর হয়। কিন্তু সেসব উত্তরে কাজ নেই। 'মন চল নিজ নিকেতনে!'

নিকেতন হল মস্তিষ্ক, তার মধ্যেকার রাসায়নিক গতি-প্রকৃতি, চিন্তা বা আবেগের উদয়, স্মৃতির কলাকৌশল, পারিপার্শ্বিকের অনুরণন, ভ্রান্তি বা বাস্তব, কত্ত কী!! এইসবের মধ্যে মনের ভাষ্য, কখনো কবিতায়, কখনো গদ্যে, কখনো সুরে, কখনো-বা বেসুরে। কখনো-বা সমাজের আস্ফালন, কখনো-বা তার নিষ্ক্রিয়তা। এইসব নিয়েই মনের ছন্দ। বিজ্ঞানীরা অতিসচল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বের গতিপথ খোঁজেন, সে প্রক্রিয়া সত্য বটে, তবে মহাসত্য নয়!!

না না, অত জটিল গল্প দিয়ে লাভ নেই, বরং গোরুতে ফিরে আসি, তা সহজপাচ্য, সহজবোধ্যও বটে।

যেমন, আমার কাছে একজন অনেকদিন আসেন, রোগী বলব না, তাতে অসম্মান হয়। তিনি বেশ কিছুদিন পরে এসে যা জানালেন, তা হল . . . ভালোই তো ছিলাম, ওষুধও খাচ্ছি, কিন্তু কিছুদিন আগে বড়ো জার্সি গোরুটা মরে গেল। আহা কি ভালো গোরু ছিল, দিনে দশ লিটার দুধ দিত, তারপর থেকেই . . .। ওনার স্বামী ঘাড় নাড়লেন, মানে এটি ঘোর বাস্তব। কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় এতটা মুহ্যমান হওয়া তত বাস্তব নয়। তাই, আবার দ্রুত আমার স্মরণ!!

যাক সেকথা, আরেকজন বাবাকে নিয়ে এসে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বাড়িতে যখন গোরু ছিল বাবাই দেখতেন। বাবা অশক্ত হয়ে পড়ায় সেসব বাদ। আর এখন তো . . . এই বাবার এখন স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, কিছুই মনে থাকে না, এমনকী গোরু পালনের কথাও কষ্ট করে . . .

যাক, মনের গোরুকে গাছে চড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি ভুলবশত চড়ে গিয়েও থাকে তবে নামাতে হবে . . .

সেসব অনেক কথা, আরও বেশ কিছু কথা।

দ্বিতীয় পর্ব

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা . . ." কালজয়ী লাইন। কিন্তু 'অন্তর' মানে মন কোথায়? কোথাও যদি ঠিক করে না থাকে, তাহলে ব্যথা হবে কেমন করে? আর যদি ধরে নিই, মনের ঠাঁই মাথায়, তাহলে কি এটা আসলে 'মাথার ব্যথা?'

নাঃ, এগুলো বুঝি ঠিকঠাক ব্যাখ্যা হচ্ছে না!

প্রেম করেছেন? প্রেমে ঝাড় খেয়েছেন? উত্তর সব 'হ্যাঁ' হলে আপনি এই 'অন্তরের ব্যথার' ব্যাপারটা জানেন। ভালো করে জানেন। এই ব্যথাটা ঠিক হাত কেটে গেলে, ছড়ে গেলে, 'অঙ্গে বোরোলিন'মেখে নেওয়ার মতো ব্যথা নয়। এটা একটা প্রাণ হু-হু করা, কোনো কিছু ভালো-না-লাগা, চোখ-জলে-ভরে-আসা, সবকিছু অর্থহীন ভেবে পৃথিবী ছেড়ে পালানোর ইচ্ছের ঝড় তুলে আনা 'ব্যথা'. . .

ঠিক ব্যথা নয়, একধরনের কষ্ট, মন ভালো না লাগা যন্ত্রণা, বিষাদ, যা স্থায়ী হলে ডেকে আনতে পারে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সমস্যার (অসুখ শব্দটা ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম।), সেটা হচ্ছে 'মানসিক অবসাদ'।

পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অন্তত ১০-১২ শতাংশ এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অবসাদের শিকার হন। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে কী হবে? সাময়িক অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলোর সংখ্যা তো আরও অনেক বেশি!

নিজের আত্মীয় প্রিয়জনকে নিয়ে শ্মশানে গেছেন বা গোর দিতে গেছেন কবরস্থানে, এমন মানুষের সংখ্যা, যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে কম নয়। আমি নিজেই এমনই অনেকবার গেছি। প্রথম বোধহয় একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মরদেহ নিয়ে।

বছর দেড়েক আগে যখন নিজের মা-কে নিয়ে গেলাম, দেহটি পড়ে আছে, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অন্য মৃতদেহ, আমার সমস্ত সত্তা তখন এই বিমূর্ত বেদনায় খানখান হচ্ছিল, মায়ের পাশে বসে। একটা কীরকম দলা পাকানো ভাব!

আবার সেইদিন ইমার্জেন্সিতে একদল রাজনৈতিক মস্তান (স্বঘোষিত সমাজসেবী!!) মুখে কিঞ্চিৎ বিজাতীয় মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, ঠিক যেন হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ খেয়ে এসেছে, আমাকে মানবিক হওয়ার শিক্ষা দিতে এসেছিল। আমার 'অমানবিক' গালে, গলায় ক্ষুরের মতো হাত বুলিয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল, 'লাশ' ফেলে দেওয়ার হুমকি

আমাদের একটা চলতি নাম আছে, 'পাগলের ডাক্তার'। . . . আর 'শা . . . পাগলের ডাক্তার, পাগল', এমন কথাও যে শুনতে হয়নি বা হয় না, তাও নয়। কিন্তু আমাদের অভিধানে এই 'পাগল' কথাটাই একটা নিষিদ্ধ শব্দ।

দিচ্ছিল, তখনও একটা অদ্ভুত নিষ্ফল রাগ, এইরকম একটা অসার যন্ত্রণার মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছিল মনের গভীরে। এরকম 'বোধ'-এর স্বীকার আমরা প্রায়ই হই, প্রায় সকলেই, কোনো-না-কোনো সময়ে।

তারপর, এই সংকট কখনো সর্বব্যাপী হয়ে সমস্ত অস্তিত্বকে দখল করে ফেলতে পারে, সাময়িকভাবে ধেয়ে আসতে পারে মৃত্যুচিন্তা, নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা। তাৎক্ষণিক আবেগে এই ধরনের ঘটনা বড়ো একটা কম ঘটে না। আবার দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ থেকেও তা আসে। সব মিলিয়ে 'আত্মহত্যা' প্রায়শই ওই 'অন্তরের ব্যথা'-রই একটা তীব্রতম রূপ যা একজন মানুষকে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ থেকে আচমকাই সরিয়ে দিতে পারে।

উফ্‌ফ, কোথা থেকে কোথায় চলে আসলাম! আসলে 'মন' তো, এভাবেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। ব্যথা থেকে আনন্দে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে।

তা হোক। কিন্তু কথা তো হচ্ছিল 'ব্যথা' নিয়ে। আমাদের একটা শরীর আছে। ব্যথা, বিষব্যথা, যন্ত্রণা, তারও কিছু কম হয় না। হাতটা কেটে গেল, পা-টা গেল মচকে, বদহজম হল, কিংবা প্রচণ্ড জ্বর . . . শরীরের 'ব্যথা' তো নানাভাবে, নানারূপে আমাদের আক্রান্ত করে, করে চলেছে অহরহ। শিরশিরে ব্যথা, কনকনে বা দপদপানি ব্যথা, জ্বলে যাওয়া ব্যথা . . . অনেক রকম প্রকারভেদ। আসলে 'ব্যথা' হল শরীরের কষ্টের প্রধানতম প্রকাশ, আর এইসব ব্যথার অনুভূতি গ্রাহ্য হওয়ার জন্য নানারকম স্নায়ু আছে যা মস্তিষ্ক অবধি নিয়ে যাবে, আবার অনুভূতি বহন করে আনবে ব্যথার জায়গায়।

এইরে, কঠিন বিজ্ঞান বোঝাতে শুরু করলাম। ছ্যা ছ্যা ছ্যা! না, না, ওসব কিছু নয়, কথা হচ্ছে, শরীরের ব্যথা নিয়ে। তার কম বা বেশি হতেই পারে! আবার, ব্যক্তি বিশেষেও কম, বেশি হয়!! একই রকম জোরে চিমটি কাটলে পাঁচজন লোক একই রকম ব্যথা পায় নাকি? পায় না। এখানেই ঠিক 'মনের' একটা ভূমিকা আছে! সেটা হচ্ছে বেদনার বোধ!! শরীর বা মন, সব যন্ত্রণার ক্ষেত্রেই এটা সত্যি . . . কারও কম হয়, কারও বেশি। এইভাবেই শরীর মিশে যায় মনে, শারীরিক যন্ত্রণার প্রকাশবোধের ফারাক, আর মানসিক যন্ত্রণার উৎপত্তির ভাবভঙ্গি, এইসবের মধ্যেই মানুষ হয়ে ওঠে 'ব্যক্তি', তার নিজস্ব 'মানসিক পরিসর' নিয়ে। মন হয়ে ওঠে শরীরেরই অংশ, সেটা কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান দিয়ে নয়, সামগ্রিক সত্তা দিয়ে, যতই মস্তিষ্ক-এর গভীরে অনেক রাসায়নিকের চলন থাকুক না কেন!!

নাঃ, বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। আসলে সক্কলে উন্মুখ হয়ে থাকেন আরও কিছু গল্পগাছার জন্য, এতসব 'ধান ভানতে শিবের গীতের' জন্য পুরোটা নয়। সেসব গল্পগাছা তো আসবেই, কথকতার সূত্র ধরেই।

সূত্রবিহীনভাবে এটুকু বলি, প্রথমদিকে বাড়িতে চেম্বার করতাম। একদিন একজনকে ধরে নিয়ে এসেছিল বেঁধেছেদে। চেম্বারে ঢোকানো যায়নি, অগত্যা বেরোতে হল রাস্তায়। উনি আমার পায়ে পড়ে গেলেন। তারপরই এক রাম চিমটি পায়ে। ব্যথায় লাফিয়ে উঠে পা সরিয়ে নিতে গিয়ে দেখি তিনি একটি চটি আঁকড়ে ধরে আছেন। পা, চটি থেকে বের করে নিয়ে সরে আসতেই, তিনি সেটিকে হাউই-এর মতো করে উড়িয়ে দিলেন, সেই চটি পরে ল্যান্ড করল পাশের গন্ধ-নর্দমায়। শারীরিক (নাকি মানসিক!) নিগ্রহের এই রকম অনেক গপ্পো আছে। আসবে ধীরে সুস্থে।

আর হ্যাঁ, আগের দিন জার্সি গোরুর দুঃখে ম্রিয়মাণ একজন মহিলার কথা বলেছিলাম। উনি আসলে আমাকে অনেকদিন ধরে দেখান, সাত আট বছর বা বেশিও হতে পারেন। এখন অল্প ওষুধে দিব্যি ভালো আছেন। প্রথমে, হাসপাতালের ওয়ার্ডে যখন দেখতে যাই ওনাকে দেখতে, উনি পাথরকুচি, ভাঙা কাচ ইত্যাদি নির্বিবাদে চিবোচ্ছিলেন! মুখ কেটেকুটে রক্তারক্তি, ভ্রূক্ষেপই নেই!!

ওই যে বলছিলাম 'ব্যথা' পুরোপুরি শারীরিক নয়, মানসিকও নয়। সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু, ব্যক্তিনির্ভর, সবসময় গ্রাহ্য করার মতো নয়, আবার অগ্রাহ্যও করা যায় না।

তৃতীয় পর্ব

গাড়িটা এসে দাঁড়াল আউটডোরের সামনে। মারুতি ভ্যান। সঙ্গে আরও

৫-৭ জন বাইকে। সব মিলিয়ে হুড়মুড় করে প্রায় জনা দশেকের এক জনতা ঢুকে পড়ল ওপিডি-র ভিতরে। মুখে স্পষ্টতই আশঙ্কার ছাপ।

ব্যাপারটা কী? যা জানা গেল, ভদ্রলোক বেশ কয়েকদিন অনর্গল কথা বলে চলেছেন, বড়ো বড়ো কথা, ঘুম নেই, দেদার পয়সা বিলোচ্ছেন, সাংঘাতিক মুডে আছেন।

বললাম, তাহলে নামিয়ে আনুন, দেখি। ওদের বক্তব্য হল, ভুলিয়েভালিয়ে এনেছি, কিন্তু এখন হাসপাতাল, তাও মানসিক হাসপাতাল দেখে নামতে চাইছেন না। বললাম, এতজন আছেন, জোর করে নামিয়ে আনুন। দু-চারজন গিয়ে নানারকম নরম স্বরে বোঝাতে লাগল, কিন্তু জোর-টোর বিশেষ কাউকে করতে দেখলাম না। বুঝলাম অ্যাকশন-এ নামতে হবে, বেশ জটিল অ্যাকশন!!

তখন আমি তুফানগঞ্জে মানে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে। সরকারি চাকরিতে প্রথম পোস্টিং। মানসিক হাসপাতাল হলেও আউটডোরই চালু ছিল তখন। ২০০০-এর জানুয়ারিতে চালু হয়, আমি যোগ দিই ওই বছরেরই ডিসেম্বরে। এখনও আউটডোরই আছে, তবে শুনেছি বড়ো ইনডোর (১০০ শয্যার)-এর বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মাঝে একবার অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ২০ শয্যার ইনডোর চালু করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়! সে কথা পরে।

এইবারে অ্যাকশনে নামার আগে আমাদের একমাত্র গ্রুপ-ডি দুধকুমারদার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিলাম। ফার্মাসিস্ট তাপসদাকে ইঞ্জেকশন তৈরির কথা বলে গাড়ির কাছে এগোলাম। অন্য কিছু রোগীর বাড়ির লোকজনকেও ডেকে নিলাম, তবে ওই রোগীর বাড়ির লোকজন তখন প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। গাড়িতে উঁকি মেরে দেখলাম এক মাঝবয়সি, মোটাসোটা, প্রভাবশালী দেখতে ভদ্রলোক লম্বা সিটের ঠিক মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে বিরক্ত মুখে বসে আছে। নামার কথা বলায় সোজ্জা 'না' বলে দিলেন। তখন নাম কী, বাড়ি কোথায় এসব হাবিজাবি কথা বলতে বলতে একপায়ে গাড়ির স্লাইডিং দরজাটা চেপে ধরে, হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলাম। একটু দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই জাপটে ধরে আরেকটু টান, ব্যস, দেহটা একটু বাইরে আসতেই, দুধকুমারদা ও অন্য আরও কয়েকজন মুহূর্তে চ্যাংদোলা করে ওপিডির বাইরের ঘরের খাটে এনে ফেলল। সিস্টার মালাদি সিরিঞ্জ হাতে রেডিই ছিল। হতচকিত ভদ্রলোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝপাঝপ দু-দুটো ইঞ্জেকশন একদম ওনার কোমরে ফুঁড়ে দেওয়া হল। সঙ্গে আসা লোকজন তখন একটু সাহস ফিরে পেয়েছে। রোগীকে বাকি সামলানোর কাজটা ওরাই করল।

ওষুধপত্র লেখা হল। চোদ্দদিন ওষুধ খেয়ে তিনি যখন আবার এলেন দেখাতে, একেবারে অন্য মানুষ, উত্তেজনার আর ছিটেফোঁটাও নেই।

ভাবছেন অনেকে, কী এমন হয়েছিল ওনার? খুব সোজা ভাষায়, ওনার ভীষণ 'ফুর্তি' হয়েছিল, একেবারে বাঁধনছাড়া ফুর্তি, ইংরেজিতে বলা যায় Euphoria (Elation ও বলা যেতে পারে!) আর এই ফুর্তিতে সামান্য বাধা পেলেই তৈরি হচ্ছিল মারাত্মক উত্তেজনা, অসংলগ্ন আচরণ।

হ্যাঁ, এটা একধরনের মানসিক সমস্যা। এক্ষেত্রে বিষাদের ঠিক বিপরীত আচরণ করে থাকে মানুষ। মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, বাঁধনহীন অসংলগ্ন আচরণ, অত্যন্ত দ্রুত কথা বলা, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়া, যা কখনোই মানুষটির আগের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না।

কিন্তু, এইসব মানুষেরা ভীষণ বিষণ্ণতাতেও আক্রান্ত হতে পারেন কখনো। এদের মানসিক অবস্থা অসম্ভব আনন্দ থেকে ভয়ংকর মন খারাপের দু-টি চূড়ান্ত অবস্থাতেই যেতে পারে। একে "বাই-পোলার ডিসঅর্ডার" বলা হয়ে থাকে। ভাগ, উপভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গে যাওয়ার কোনো উৎসাহ নেই। চিকিৎসা আছে, মূলত ওষুধের চিকিৎসায় মনটাকে মাঝামাঝি পরিসরের মধ্যে রাখা সম্ভব, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী, অনেক ক্ষেত্রে জীবনভর।

আমি এই প্রথম সরাসরি একটি গুরুতর মানসিক সমস্যার মধ্যে ঢুকলাম, তাও আবার এক্কেবারে শুরুতে। আগের দুটো পর্বে ঢুকিনি। আসলে বিষাদের আলোচনা করেছিলাম আগে, আনন্দও যে অতি মারাত্মক হতে পারে তার ইঙ্গিত দেওয়াটাও দরকার ছিল। না না, তাই বলে আনন্দ করবেন না, ফুর্তি করবেন না এমন নয়, অবশ্যই করবেন। কারণ . . .

কোনো মানসিক সমস্যাকে অসুখের পর্যায়ভুক্ত করতে দু-টি প্রধান জিনিসের কথা মাথায় রাখতে হয়, ১. এই আচরণ নিয়মিতভাবে সামাজিক সমস্যার কারণ হচ্ছে কিনা, আর ২. কাজের জায়গায় প্রাত্যহিক অসুবিধা তৈরি করছে কিনা। ইংরেজি শব্দটি বেশ সুন্দর, socio-occupational impairment। তা নিয়মিতভাবে না হলে ভাবতে বসে যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

আর হ্যাঁ, এই আচরণের বা সমস্যার সঙ্গে যদি কোনো নেশার জিনিসের সরাসরি সম্পর্ক থাকে, তা হলে পরিপ্রেক্ষিতটা অনেকটাই পালটে যায়।

এগুলো হল সব আবেগজনিত সমস্যা, এরসঙ্গে উৎকণ্ঠার সমস্যা এখনও আলোচনা শুরু হয়নি, আর সর্বোপরি আছে চিন্তার সমস্যা। এগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছে।

তার উপরে বাচ্চাদের সমস্যা, বৃদ্ধদের সমস্যা, বুদ্ধির সমস্যা, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, নেশার সমস্যা, আরও কত্ত কী!!! ওরে বাবারে, এই সিরিজ লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে রে, আমার চুল উঠে যাবে রে . . .

নাঃ খ্যামা দেন কত্তারা, দিদিমনিরা। লেখা থেকে নয় গো। আপাতত এই তিন নমবোর পববো থেকে।

সবশেষে বলি, তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালের ইনডোরে প্রথম যে রোগী চিকিৎসাধীন হয়ে এসেছিল, তার আক্রমণে দুধকুমারদার হাত ভেঙেছিল, দুটো-তিনটে পাঁজর ভেঙেছিল, সর্বোপরি ফুসফুসের একটি অংশে চোট লেগে, নিউমোথোরাকস (pneumothorax) হয়েছিল। সিস্টারও বেশ জখম হয়। আমি তখন তুফানগঞ্জ ছেড়ে চলে

এসেছি। খবর পেয়েছিলাম।

এরপর ইনডোরে ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে মানসিক অসুস্থতা থাকলেই মানুষ খুব হিংস্র হবেন, তাঁরা খুব বিপজ্জনক, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পরিকাঠামোর সমস্যা ছিল বলেই মনে হয়। খুব অল্প সংখ্যার মানুষই এইধরনের আচরণ করতে পারেন, তাঁদের সামলাতে হয়। কিন্তু বেশিরভাগটাই এমন নয়, বরং সাধারণ অন্য মানুষের মতোই। সহৃদয়ভাবে, এঁদের অধিকাংশ, হ্যাঁ শতকরা ৯৫ শতাংশেরও বেশি মানুষের চিকিৎসাই বাড়িতে করা যায়, এবং অতি অনায়াসে। বাকিদেরও সাময়িক সময়ের জন্য হাসপাতাল বাসের প্রয়োজন হতে পারে। শুধু সমস্যাটা শুরু হওয়ার পরে প্রথমেই চিহ্নিত ও চিকিৎসা শুরু হওয়া জরুরি।

চতুর্থ পর্ব

আমাদের শহরে কাল ছিল 'দোল'। আর আজ হল 'হোলি'। এরকম অনেক জায়গাতেই হয়। প্রথমদিনে আবীর দিয়ে 'ভূত' বানানো বা 'ডিজাইনার' খেলা, আধুনিক নিয়মে। আদতে বোধকরি মূলত মহিলারাই থাকতেন, অন্তত বেশি থাকতেন, তবে আজকাল পুরুষরাও। এগুলো একধরনের 'ফ্যাশন স্টেটমেন্ট', মূলত রাঙাকাকু রাঙাকাকিমা-র ছবি তোলবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

আর আজকের উৎসব, একেবারে 'হা রে রে রে' প্রকৃতির। তেল, জল, খুনি রং, আরও কত্ত কী দিয়ে এক ভয়ানক, 'অতিরঞ্জিত' খেলা। এ খেলায় সবাই মাতেন না, যাঁরা মাতেন তাঁরা বাদে, খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষজন রাস্তায় নামেন না, ফাঁকা রাস্তায় কোথাও কোথাও ধুন্ধুমার, যানবাহন কম, নেই বললেই চলে, দোকানপাট, অফিস-কাছারি বেশিরভাগটাই বন্ধ।

কাল বেশ কয়েকটা 'বড়া' খাওয়া হয়েছিল, তার ভিতরে বাঁধাকপি না অন্য কোনো বিশেষ শাকপাতার পুর দেওয়া ছিল, তাই নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই! তবে বেশ কিছুক্ষণ বাদে, মাথায় বেশ একটা 'টলমলে' ভাব হয়েছিল, কারও কারও কিঞ্চিৎ ভুল বকার ঝোঁক, বা হাসির ফুলঝুরি, কিছু নিমীলিত নেত্র। এইসব নিয়েই এক বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুদের সম্মিলিত ভোজ, কিঞ্চিৎ রং খেলা, বাচ্চাদের হইহই, জমজমাটি আড্ডা, সব মিলিয়ে দিনটা জমেছিল বেশ। ঘরে ফেরার পরেও যার রেশ থেকে যায় সবদিক থেকেই।

লিখছি তো বাবা মন নিয়ে, তা এমন দোলের বা হোলির বিষয় নিয়ে কচরমচর শুরু করলাম কেন??? তার কারণ, ওই যে বললাম, মাথার ভেতর 'টলমল'. . . কীসব বড়ার কীইইসব এফেক্ট।

এরকমই হয়, নেশা করলে। নেশার কি আর শেষ আছে!! দোলের আগের দিন কিছু কিছু দোকানে লম্বা লম্বা লাইন পরে, বোতলজাত তরল বগলস্থ করে, বা ব্যাগজাত করে ঘরে ফেরার জন্য, হোলিকে আরও রঙিন করে তোলার জন্য। এঁদের কেউ নিয়মিত-পায়ী, বিশেষ দিনে মাত্রাটা চড়ে, আর কেউ কেউ অনিয়মিত, উৎসবের মেজাজে মনটা ফুরফুরে করার জন্য কিছু বিশেষ দিনে কিছু কিছু। এঁদের মাঝামাঝি আরও বহু মানুষ আছেন, মাত্রার ফারাকের হিসেবে।

সামাজিকভাবে স্বীকৃত এই নেশাটি সারা পৃথিবী জুড়েই চালু এবং আমাদের নানা সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। এই অ্যালকোহলপ্রেমীদের নিয়ে নানা রকম সামাজিক সমস্যা যেমন প্রায়শই হয়, মানসিক ও শারীরিক সমস্যা কিছু কম হয় না।

এ তো গেল জলের রাস্তা, এছাড়া আরেক রকম 'বায়বীয়' নেশা বেশ চালু, আমাদের দেশে অবৈধ, কোনো কোনো বাবা বৈধ করার জন্য জরুরি দরবার করছেন, পৃথিবীতে কিছু দেশ বা কিছু দেশের কিছু প্রদেশে বৈধ। এটি গাঁজা, ভোলেবাবার পেরসাদ হিসেবে এদেশে, মারিজুয়ানা হিসেবে বিদেশে পরিচিত। অনেক চালু নাম আছে, অনেক রকম 'চেহারায়' আছে। এই নেশা নিয়মিত বেশি পরিমাণে করার বিপদ আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়।

এছাড়া আছে, আফিম বা আফিমের থেকে তৈরি হওয়া নানারকম মাত্রার জিনিস, যেমন হেরোইন। এগুলোও নেশা যারা করে তাদের মধ্যে ভালোই প্রচলিত, আর 'স্বাস্থ্য সমস্যা' হিসেবে সবচেয়ে মারাত্মক। আফিমগোত্রের (opoid) সিনথেটিক ওষুধ, মুখে খাওয়ার মতো ওষুধ (ট্যাবলেট বা সিরাপ আকারে) বা ইঞ্জেকশন, এইসব কিছুরও বহুল প্রচলন আছে।

এছাড়া কড়া নেশার মধ্যে আছে কোকেন, অত্যন্ত দামি, এদেশে খুব বড়োলোকদের 'রেভ পার্টি' ইত্যাদিতে কিছু প্রচলন থাকলেও, সাধারণভাবে প্রচলিত নয়। বিদেশে কড়া নেশাখোরদের মধ্যে ভালোই জনপ্রিয়।

আছে ঘুমের ওষুধ। কিছু ব্র্যান্ড আপনি বা আপনারা জানেন, নেশার সামগ্রী হিসেবে নয়, ঘুমের ওষুধ হিসেবেই। কিন্তু যদি মাত্রাটা ক্রমশ বাড়তে থাকে, দিনের বেলাতেও ব্যবহারের ইচ্ছে হয়, ওষুধ খাওয়ার পরে বেশ মজা লাগে, কোনোদিন ওষুধ না থাকলে চূড়ান্ত অস্থিরতা হয়, তাহলে কিছুটা হলেও আপনি এই ঘুমের ওষুধের নেশার চক্করে একটু হলেও পরে গেছেন।

আজকাল কমবয়সিদের একটা নেশা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, শোঁকার নেশা। মূলত 'ডেনড্রাইট' জাতীয় পেট্রোকেমিক্যাল থেকে উদ্ভূত থিকথিকে আঠার মতো জিনিস, প্লাস্টিক প্যাকেটে ঢেলে উগ্র গন্ধটা শোঁকা হয়, এতে মাথাটা নাকি হালকা লাগে, উড়ুউড়ু ভাব হয়। এনজেপি স্টেশনে, প্লাটফর্মে থাকা শিশুদের একসঙ্গে রাত্তির বেলায় এই নেশা করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আবার অন্তত একজন বা দু-জনের আমি চিকিৎসা করেছি, যারা বড়ো হয়েও এই নেশা ছাড়তে পারেনি, অন্য নেশায়, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ছোট্ট শহরে কমবয়সিদেরও এই নেশার চিকিৎসা করতে হয়েছে।

এর বাইরে আছে, ভাঙ, সিদ্ধি যা মূলত গরিব মানুষের নেশা। গাঁজাও প্রায় তাই। আছে তামাকের নানারকম ব্যবহার, পান (জর্দা সহ), সিগারেট, বিড়ি, খৈনি, নস্যি, গুটখা . . . কত রকম নাম। শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যার পরিমাণও কম নয়।

আছে, 'প্যাসিভ স্মোকিং'-এর সমস্যা। এর বিরুদ্ধে প্রচারও উচ্চগ্রামে চলে, তাতে হয়তো নিয়ন্ত্রণ কিছুটা বেড়েছে। উন্নত দেশেও তাই। সিগারেট কোম্পানিগুলি, যেমন ITC অন্য ব্যবসায় লগ্নি বাড়াচ্ছে, কেউ কেউ আবার এশিয়া বা আফ্রিকার আরও অনুন্নত দেশে ব্যাবসা ছড়াচ্ছে।

এছাড়াও কিছু "অফ বিট" নেশা আছে। যার মধ্যে এমফেটামিন গোত্রীয় স্টিমুলেন্ট আছে, মজার ব্যাপার এটা কমবয়সিদের ক্ষেত্রে কিছু মানসিক সমস্যায় জরুরি ওষুধ, কিন্তু বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে নেশার জিনিস। আমাদের দেশে সরকারি বিধিনিষেধের চক্করে ওষুধটি পাওয়া বা নির্দিষ্ট ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও রীতিমত ঝকমারি বিষয়।

সবশেষে চা বা কফি, কিছু গুণ থাকলেও মূল রাসায়নিক ক্যাফেইন বেশি মাত্রায় উত্তেজক ধরনের নেশার জিনিস।

এ-গুলো হল নেশার বস্তুর বিবরণ। কিন্তু কোনটা কীভাবে অসুবিধা তৈরি করে, কেন এইসব নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে মানুষ, এইসব অনেক প্রশ্ন আছে। থাকতেই হবে, শুকনো শুকনো নেশার বিবরণে কি আর চিড়ে ভেঁজে?

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, মানুষ কেন নেশা করে, কীভাবে ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়ে? আসলে যেকোনো নেশারই একটা নিজস্ব prize value আছে, মানে 'পুরস্কার মূল্য'। কী সেই পুরস্কার?? মনের মধ্যে, মাথার মধ্যে একটা হালকা টলমলে ভাব, একটু ফুর্তির ভাব, কথা বলতে ভালো লাগা, ইংরাজিতে বলে Expansive Mood, মানে আবেগের একধরনের মসৃণ বিস্ফোরণের মতো, সবকিছু ভালো লাগতে লাগা, কিছু এলোমেলো করেও, কথা বা শরীরের জড়তা সত্ত্বেও, একটা বেশ উত্তুঙ্গ অবস্থা।

সব নেশাতে একই ধরনের ব্যাপার হয় না, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই এমন কিছু হয়, যে নেশা করছে, সে এটাকে ভালোবেসে ফেলে। এই অবস্থাটা ফিরে ফিরে আসুক তাই চায়।

আজকাল এটার একটা সুন্দর নাম হয়েছে, "addictive behaviour", মানে "নেশাপ্রবণ ব্যবহার", যারা নেশা নিয়মিত করে তাদের এই ধরনের আচরণের প্রাবল্য দেখা যায়।

তবে অ্যাডিকশন শুধু কিছু খেলাম, তার থেকে হল, এরকম নাও হতে পারে। অন্য কিছুরও হতে পারে, যেমন আমরা প্রায়শই শুনে থাকি, বইয়ের নেশা, খেলার নেশা, মাছ ধরার নেশা . . . এগুলো ঠিক ক্ষতিকর নেশাপ্রবণ ব্যবহার নয়। কিন্তু ক্ষতিকরও কিছু আছে। এরমধ্যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেছে, "internet addiction"-কে, কারণ এই সংক্রান্ত সমস্যা, কমবয়সি মানুষদের মধ্যে সারা পৃথিবীজুড়ে বাড়ছে, মানসিক, শারীরিক, সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে।

সমাধানের রাস্তাগুলো সহজ নয়, আলোচনার অন্যান্য পর্বে, সাধ্যমতো আনতে চেষ্টা করব।

একটা বিষয় আলাদাভাবে উল্লেখ করছি, বিদেশে মদ্যপান বা ধূমপান, ছেলেদের মধ্যে বেশি হলেও, মেয়েদের মধ্যে নেহাত কম নয়। কিন্তু আমাদের দেশে একদম নিম্ন আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় আর ঠিক এর উলটো, অত্যন্ত উচ্চ আর্থসামাজিক পরিকাঠামোতে মেয়েদের এইরকম ঝোঁক চালু ছিল, মধ্যবিত্তদের মধ্যে ততটা নয়, পান-জর্দার চলটাই বেশি ছিল। আজকাল নগরায়ণের দ্রুততায় মেয়েরাও পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। এই নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। শুধু একটাই বক্তব্য, মূলত চিকিৎসক হিসেবে, প্রসবের প্রস্তুতি থেকে প্রসবের পরে যখন শিশু বুকের দুধ খায় সেই পর্যন্ত, এইগুলির ব্যবহার পরিত্যাজ্য। অন্যথায় কিছু অসুবিধার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

ভারী ভারী, গম্ভীর কথা তো অনেক হল। আজ সন্ধ্যায়, হোলির দিনে, পাড়ার মুদিখানার দোকানে একটু গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি অল্পবয়সি ছেলে ফাঁকা রাস্তায় কিঞ্চিৎ ব্যাঁকাট্যারাভাবে সাইকেল চালাতে চালাতে আসছে, আর বলছে, এই ঠিক করে চলো, ঠিকসে . . . .। বলতে বলতেই, দোকানের সামনের ল্যাম্পপোস্ট-এর গায়ে কোনোরকমে সাইকেলটা ছুঁড়ে দিয়ে, ধপাস করে মাটিতে, ঘাসজমিতে শুয়ে পড়ল, কিছুক্ষণ নিথর, তারপর বুকে হাঁটার চেষ্টা করল, কোনোরকমে উঠল, সাইকেল ভালো করে স্ট্যান্ড করাল, আড়মোড়া ভেঙে আমাদের দিকে এগিয়ে এল, স্বগতোক্তির ঢং-এ ক্রমক্ষীয়মাণ স্বরে বলল, আপনারা দেখলেন একটা ছেলে পড়ে গেল। এবারে টলমল করে আরেকজন দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলের দিকে এগোল,

বইয়ের নেশা, খেলার নেশা, মাছ ধরার নেশা . . . এগুলো ঠিক ক্ষতিকর নেশাপ্রবণ ব্যবহার নয়। কিন্তু ক্ষতিকরও কিছু আছে। এরমধ্যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেছে, "internet addiction"-কে।

কাছে গিয়ে কিছু বলল বিড়বিড় করে, বা বলল না। স্যাট করে আবার পিছিয়ে এসে পোস্টের গা ঘেঁষে ব্যালান্স করল। এরই মধ্যে একটি টোটো বেরিয়ে গেল, যাতে স্বামী স্ত্রী উচ্চগ্রামে ঝগড়া করছে, প্রবল অশ্লীল শব্দের ব্যবহারসহ, বাচ্চার সামনে। . . . ছেলেটি আবার টলমল করে সাইকেলের কাছে। বুঝলাম ওর সেরেবেলাম [মস্তিষ্কের পেছনের অংশ, যা শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখে!] নেশার চক্রান্তে সাময়িক অকেজো, তবে বাড়ি সম্ভবত কাছেই, পৌঁছে যাবে ঠিক। পরিবেশটা ভালো লাগল না, বাড়ি ফিরে আসলাম।

আবার আসিব ফিরে। তদ্দিন, ভালো থাকুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা.স্বস্তিশোভন চৌধুরী, এমবিবিএস, ডিপিএম, এক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও তার প্রশিক্ষণ

স্বাতী মুখার্জ্জী ঘোষাল

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও তার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আগেই জেনে গেছি শিশু বিকাশের মাইলফলকগুলি। এবার আমাদের জানতে হবে একজন শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য অভিভাবকের কী করণীয়। শিশুর বিকাশের জন্য তার পরিবেশ (Environment) এবং মা-বাবার দ্বারা লালনপালন (Parenting) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। বাচ্চা কতখানি বুদ্ধিমান হবে, সফল হবে কি না, আবেগ আয়ত্তে রাখতে পারবে কিনা ইত্যাদি সবকিছু নির্ধারিত হয় বাল্যকালে এবং কৈশোরে। কারণ এই সময়ের মধ্যেই মন এবং মস্তিষ্কের গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এবং এই গঠনের পর্যায়ে যত তাকে বর্ণময় পরিবেশে রাখা যায় যত বেশি মানসিক উদ্দীপনা দেওয়া যায়, মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা তত বাড়ে। তত সংবেদনশীল হয় মন। অর্থাৎ, মূল কথা শিশুর বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করছে বাবা-মা কেমন পরিবেশে বড়ো করে তুলছেন এবং তাদের ভুমিকার উপর। কাজেই সঠিক পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তার জন্য কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে।

যেমন

- বাড়িতে ঝগড়া, অশান্তি যত কম হয় তত ভালো;
- বাচ্চা একটি দু-টি করে কথা বলতে শুরু করলে অনেক সময় নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে হবে;
- টিভি যেন না চলে, কারণ টিভিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম দিকগুলির বিকাশ হবে না;
- বাচ্চাকে রূপকথার গল্প শোনালে তার কল্পনা শক্তি বাড়ে;
- বাচ্চার সঙ্গে কথা বলার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বাবা-মা আধো আধো স্বরে কথা বলেন। এটা না করাই উচিত কারণ বাচ্চার ভাষা বিকাশের সময় সে বড়োদের অনুকরণ করে। বাচ্চার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলা উচিত;
- ধরতে শেখার পর বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ঘনত্বের নানা রকম রঙিন খেলনা কিনে দিতে হবে, এতে বাচ্চার different types of grasping develop করবে এবং রং চিনতে শিখবে।
- খাওয়া-দাওয়া এবং পুষ্টি বিষয়টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। ৬ মাস দুধ খাওয়ার পর্ব কমে গেলে সুস্বাদু, পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। ভারতবর্ষে শিশুদের যথাযথ বিকাশ না হওয়ার একটি মূল কারণ হল অপুষ্টি। আরেকটি কথাও উল্লেখ্য খাওয়ার বিষয়ে চাপাচাপি করা কখনোই উচিত নয়। জোর করে খাওয়ানোর অভ্যাস করা উচিত নয়। বাচ্চা মনের আনন্দে পুষ্টিকর, সহজপাচ্য খাবার খেলে তার মস্তিষ্কের বিকাশ বেশি পূর্ণতা পাবে।
- ক্লান্ত, অবসন্ন, বিরক্ত বাবা-মা কিছুতেই শিশুকে উৎসাহ দিতে পারে না। মা-বাবাকে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেকোনো ভালো কাজ করলে শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে। সমস্যা সমাধানে রাগারাগি বা বকাবকি না করে বুঝিয়ে বলা বা আলোচনা করা সহস্র গুণে ভালো। বাচ্চা সমস্যায় পড়লে তার সঙ্গে আলোচনা করলে সে problem solving-এর রাস্তা খুঁজে পায়, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে। বেশি রাগারাগি বা বকাবকি করলে শিশুর মধ্যে মিথ্যা বলার প্রবণতা বাড়ে। কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকলে নঞর্থক ভাবে না বলাই ভালো। যেমন এই জামাটা পরতে হবে না বলে অন্য একটা জামা সামনে ধরে বলতে হবে 'এই জামাটা পরো' কারণ—ক্রমাগত নেতিবাচক কথা শুনলে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বাচ্চার ঘর, খেলনা জিনিসপত্র সব উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন। ঘরে ছবির বই, রং, পেনসিল বক্স জাতীয় জিনিস চারপাশে ছড়ানো থাকলে এবং তার ইচ্ছেমতো সেগুলি ব্যবহার করতে দিলে শিশুর মানসিক বিকাশ ভালো হয়। বাচ্চা যদি সেইগুলি নষ্ট করে তাকে বারণ করতে হবে কিন্তু কখনোই বকাবকি করা উচিত নয়।
- জীবনযাপনের কয়েকটি নিয়মকানুন শিশুকে শেখানো উচিত। যেমন কেউ হাসলে প্রত্যুত্তরে হাসা, সঠিক জায়গা মতো Good Morning, Thank You, Sorry বলতে শেখানো। এইগুলি বাচ্চার social

development (সামাজিক বিকাশ) হতে সহায়ক। বন্ধুত্বের বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। বাচ্চার বন্ধু আছে কিনা, থাকলে কী ধরনের বন্ধু, না থাকলে কেন নেই সেগুলি অভিভাবককে জানতে হবে কারণ peer relation তৈরি হওয়া একটা বাচ্চার সামাজিক বিকাশের জন্য খুব প্রয়োজন। বাচ্চা যদি সহজে বন্ধুত্ব না করতে পারে তাকে কখনোই দোষ দেওয়া উচিত নয়। শিশুর বাবা-মা লাজুক ও ঘরকুনো হলে শিশুও সেটাই করতে শেখে। এক্ষেত্রে সবাই মিলে কাজে নামাটা জরুরি।

এবার আসা যাক শিশুর বিকাশ যদি বিলম্বিত (delayed) হয় সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের কী করণীয়।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন

☞ ১২-১৫ মাস বয়সের পরেও নিজের নাম, ছোটোখাটো একটি দু-টি নির্দেশ (simple verbal instruction) বুঝতে না পারা।

☞ কথা বলার সময় একদম eye contact না করা, জোরে শ্বাস টেনে অথবা দম বন্ধ করে কথা বলা বা স্বাভাবিক স্বরে কথা না বলা।

☞ ৩ বছর পার হয়ে যাবার পরে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া।

☞ একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা।

☞ কথা বলা ও কাজ করার মধ্যে যদি অনেক ফারাক থাকে, পড়াশুনোতে যদি অনেক পিছিয়ে থাকে এরকম হলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনশ্চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্ভাব্য কারণ/কেন এমন হয়?

- স্নায়ুতন্ত্রের কিছু সমস্যা।
- বধিরতা।
- জড়বুদ্ধি।
- জন্মের আগে বা পরে কোনো আঘাত।
- মনোযোগ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা।

কী করণীয়?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিষয়গুলি অবহেলিত হয় কিংবা 'বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে' এই জাতীয় একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিভাবকেরা বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামান না। তার ফলে যথাযথ সময়ে training শুরু হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সঠিক সময়ে সঠিক প্রশিক্ষণ শুরু করলে শিশুর অনেক উন্নতি হয়। বিশেষত, অটিজম্, সেরিব্রাল পলসি, জাতীয় সমস্যাগুলি যত তাড়াতাড়ি শনাক্ত (identify) করা যায় শিশুর পক্ষে ততই ভালো। এক্ষেত্রে বাবা-মাকে নিয়ে একটি সমস্যা হয়, তাঁরা বাচ্চার এই সমস্যাটি মানতে চান না বা কখনো বুঝতে পেরেও নিজেদের অসহায় বোধ করেন। অপরাধবোধে ভোগেন। বাচ্চাকে অবহেলা (neglect) করেন বা বাড়াবাড়ি রকমভাবে আগলে (over protection) রাখেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিভাবকদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে এবং অবশ্যই বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে training দিতে হবে।

বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী অনেক সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে শেখাতে হবে। তাদের প্রতিটি Special Educator (বিশেষ প্রশিক্ষক)-এর পরামর্শমতো Training করাতে হবে যেমন personal skill, social skill, academic skill ইত্যাদি। বাচ্চার বয়স অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষক যেভাবে পরামর্শ দেবেন সে অনুযায়ী বাড়িতে training দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিশুর যদি বুদ্ধি সংক্রান্ত, মনসংক্রান্ত, আবেগজনিত, শিক্ষণজনিত কোনোরূপ সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ শিশুটির পরবর্তী প্রশিক্ষণে সহায়ক হবে। বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী Adapted Material Instruction Curriculum-এর দ্বারা বাচ্চাকে training দেওয়া প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিশেষ প্রশিক্ষণ বা Special Education সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে এখনও অনেক মানুষেরই যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। কিন্তু অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্য এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে। Special Educator বা বিশেষ প্রশিক্ষকের কাজ হল কোনো শিশুর শিখন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে তা assess করে তার বয়স ও current level অনুযায়ী goal select করা এবং তার উপর ভিত্তি করে তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া, যথা সময়ে তাকে মূল্যায়ন (evaluate) করা। একজন শিশুর যদি শিখন সংক্রান্ত সমস্যা থাকে তাহলে তাকে প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে একজন Special Educator-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক দু-টি শিশু মনোবিকাশ বিভাগের সঙ্গে Special Educator হিসাবে যুক্ত।

হারিয়ে গেল খেলা

রুমঝুম ভট্টাচার্য

আমরা যারা গত শতাব্দীতে জন্মেছি সেই আমাদের ছোটোবেলায় খেলার প্রকৃতি (Nature) যা ছিল আজ প্রযুক্তি-নির্ভর দ্রুত ধাবমান জীবনশৈলীর প্রভাবে তা অনেকটাই পরিবর্তিত। প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রা ও পরিবর্তিত জীবন-শৈলী এ-দুটোই আজকের মানুষের সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। আর সামগ্রিক এই পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তার মানসিক গঠনের ওপরেও। খেলা কীভাবে বদলে গেল, তার প্রভাব কীভাবে পড়েছে মানুষের সামাজিক ও মানসিক জীবনে, সেইসব নিয়েই এবারের লেখা—

শহরের থেকে উধাও হল সবুজ মাঠ

বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই পাড়াগুলি সরগরম হয়ে উঠত ছেলে-মেয়েদের কলকাকলিতে—গো-ও-ওল!! বা ধাপ্পা-আ কিংবা বৃদ্ধা মাসিমার জানালার কাচ বল লেগে চুরচুর হওয়ার শব্দ। এমনও হয়েছে বাগানে বল ফেলার অপরাধে আটকে রেখেছেন কোনো বয়স্ক রাগী পাড়াতুত জেঠু। সব বন্ধুরা মিলে আবেদন নিয়ে গেছে তাদের বল কুড়োতে যাওয়া, আটকে পড়া বন্ধুকে উদ্ধার করতে। সেই সব চিলতে চিলতে সবুজ মাঠ পাড়ার থেকে উধাও। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (মূলত অভিবাসন বা Migration) ও যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের চাহিদা মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠল ফ্ল্যাট। সবুজ মাঠগুলি গেল উধাও হয়ে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও খুদেরা

বাড়ল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দৌরাত্ম্য। ভালো স্কুলে পড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার বাসনায় মা-বাবারা খুদেদের পাঠাতে লাগল অনেক দূরের স্কুলে। বাড়ির কাছের স্কুলের পড়ার সুযোগ কম। এতে খুদে পড়ুয়াদের হাতে বিকেলের খেলার সময়টুকু নেই। বাড়ির কাছের মাঠগুলোও নেই। তবে উপায়? আছে। খেলতে হলে ক্লাবে ভর্তি হও। ট্রেনার বা কোচ তোমাকে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস যা চাও তাই শেখাবে। কিন্তু সেখানেও প্রতি-যোগিতার ইঁদুর দৌড়ে নাম লেখাতে হবে তোমায়। শুধুই বলে লাথি মারার অনাবিল আনন্দ হারিয়ে গেছে পাড়ার মাঠগুলোর মতোই। খেলার কোচিং-এ পারফর্ম করতে না পারলে, শুনতে হবে 'ওকে নিয়ে যান এ খেলাটা ওর দ্বারা হবে না'। এই পরাজয়ের গ্লানি আচ্ছন্ন করেছে শৈশব। এককালে যে শৈশবে 'খেলা' মানে ছিল অপার আনন্দ, দু-ঘণ্টার জন্য সব পরাজয় ভুলে বন্ধুদের সাথে এক দৃঢ় বন্ধনে জড়িয়ে পড়া, মানসিক এক আশ্রয়—খেলার মাঠ। আজ সেই পরাজয়ের গ্লানি ভোলার মাঠ হারিয়ে গেছে শিশুর জীবন থেকে।

রূপ বদল করে এসেছে কচিকাচাদের শৈশবে। স্কুলের শেষে আর এক স্কুলের রূপে।

পড়ার চাপ, কম্পিউটার, ভিডিও গেমস, মুঠোফোন

পড়ার চাপ খুব বেশি। ওকে কী করে খেলার মাঠে নিয়ে যাব বলুন, সময় নেই। ক্লাস থ্রি-এ পড়া অর্ণব অতিচাঞ্চল্য (hyperactivity) রোগে ভুগছে। তার কাউন্সেলিং করতে গিয়ে যখন উপদেশ দিলাম বিকেলে খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখন অর্ণবের মা জানাল থ্রি-এ পড়া এই শিশুটির নাকি খেলার সময় নেই। ভাবলাম জানতে চাই তবে কি পড়া শেষ হলে কর্মজীবনে প্রবেশ করলে ও বল নিয়ে পাড়ার মাঠে গিয়ে খেলার সময় পাবে? প্রশ্নটা করা হল না। তবে মাথায় পাক খেতে লাগল নিশ্চয়ই। অর্ণবরা শিশুর মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তবে শর্তসাপেক্ষ কিছু খেলা তারা খেলে বই কী যেমন—ভালো করে মন দিয়ে পড়ে নিলে তোমায় ভিডিও গেম বা কম্পিউটার গেম খেলতে দেওয়া হবে। বাইরে খোলা মাঠের ছুটোছুটি করার পরিশ্রম থেকে তারাও বাঁচল। ঘরে বসেই ভার্চুয়াল খেলা মন্দ কী?

কী পেলাম আর কী হারালাম?

হারানোর লিস্টটা লম্বা। সামাজিক সম্পর্ক, বাস্তব পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction) নেই। একটা মেশিন যখন শিশুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তখন মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি শেখার বা রপ্ত করার সুযোগ সেখানে নেই বললেই চলে। যান্ত্রিক বোঝাপড়া শিশুকে করেছে আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ। উপরন্তু, কায়িক পরিশ্রমের অভাবে ও ফাস্টফুডের দৌলতে স্থূলতার শিকার হচ্ছে তারা।

পাড়ার যে জেঠু বল পড়েছে বলে ছোটোবেলায় আটকে রেখেছিলেন, সেই জেঠু যখন অসুস্থ হলেন তখন সেই ছেলেগুলোই ডাক্তার বদ্যি ডাকল, প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াল। এই সামাজিক সম্পর্কের টান আজ

> পড়ার চাপ খুব বেশি। ওকে কী করে খেলার মাঠে নিয়ে যাব বলুন, সময় নেই। ক্লাস থ্রি-এ পড়া অর্ণব অতিচাঞ্চল্য (hyperactivity) রোগে ভুগছে।

অনেক শিথিল। কারণ শৈশব থেকেই মানুষ একা থাকা শিখে যাচ্ছে এবং উপভোগও করছে। প্রযুক্তির দাপট শিশুর খেলার ধরনধারণ বদলে দিয়েছে। তার সঙ্গে বদলে গেছে তার জীবনে মানুষের উপস্থিতি ও অবস্থান। ছোট্ট পরিবারের গুটিকতক মানুষ ছাড়া কাকে আর চেনে সে? ডোরেমন, পোকেমন, এই সব চরিত্ররা ভিড় করে আসে কি তার স্বপ্নে! হারিয়ে গেল অনেক খেলা। এই খেলাগুলি সচরাচর শিশু বয়সে আমরা অনেকেই খেলেছি কিন্তু আজকের শহুরে শিশুর জীবনে সে সব খেলা অনুপস্থিত। এক্কা-দোক্কা, চাবি-তালা, পিট্টু, গুলি (কাচের), ড্যাংগুলি, আইশ-বাইশ, কত এরকম খেলা উধাও হয়েছে সমাজ জীবন থেকে।

খেলা মানুষের সামাজিকতার অঙ্গ। শিশু, দলবদ্ধভাবে কোনো খেলায় যুক্ত থাকলে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক গুণ শিক্ষা করার সুযোগ পায়। তার সময় জ্ঞান, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাবনা

> এক্কা-দোক্কা, চাবি-তালা, পিট্টু, গুলি (কাচের), ড্যাংগুলি, আইশ-বাইশ, কত এরকম খেলা উধাও হয়েছে সমাজ জীবন থেকে।

পরিশিলিত ও মার্জিত হয়। সেই খেলার রূপ ও প্রকৃতি বদল আজকের সমাজে এক ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে যা কিনা আগামী সময়ে আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে। তাই সেই ভয়ংকর প্রভাব সম্বন্ধে মানুষের সচেতন হওয়ার আশু প্রয়োজন আছে। এই নিবন্ধ সেই ভয়ংকর প্রভাবগুলির আলোচনা সম্বন্ধীয় মুখবন্ধ বলা চলতে পারে।

খেলা নামক এই সামাজিক কার্যটির আঙ্গিক বদলে যাওয়ার ফলে মানসিক স্বাস্থ্য কী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আলোচনার ইচ্ছা নিয়ে আপাতত এ লেখা শেষ করছি। সুধী পাঠকগণের কাছে অনুরোধ এ বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। শিশুর মৌলিক অধিকারের দাবিতে আওয়াজ তুলুন। আমরা বড়োরাই পারি ওদের সুস্থভাবে গড়ে তুলতে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন সাইকোলজিস্ট ও প্রাবন্ধিক।

Advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

স্বাস্থ্য, অসুখ, পরিষেবা ও ডাক্তারদের মুষ্টিযোগের কাহিনি

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।" এ লেখা এ অসুখকে বোঝার একটি ছোট্ট পরিক্রমণ মাত্র।

বেশ কিছুদিন আগে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*-এ অমর্ত্য সেন একটি আমন্ত্রিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন "স্বাস্থ্য: ধারণা বনাম অবস্থা'।[১] সেখানে রোগীর নিজের রোগ সম্পর্কে এবং রোগ ও রোগী সম্পর্ক ডাক্তার বা প্যাথোলজিস্ট-এর মতামত এই দুয়ের মাঝে টানাপোড়েন ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর জোর ছিল স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে। বিহারের উদাহরণ দিয়ে, যেখানে অর্থনীতি ও শিক্ষার হার অনেক নীচে, প্রবন্ধে দেখানো হয়েছিল যে সেখানে রোগীর নিজের রোগ সম্পর্কে তথ্য জানানোর হার অনেক কম। অথচ শিক্ষার হারে ভারতের সবচেয়ে অগ্রণী রাষ্ট্র কেরালাতে এরকম তথ্য জানানোর হার অনেক বেশি। পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা পরিষেবা, পরিষেবা নেবার জন্য রোগীদের আগ্রহ ও বাস্তব অবস্থা, যথেষ্ট মাত্রায় পরিষেবা পৌঁছোনোর বাহক ব্যবস্থাগুলো সবকিছু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, স্বাস্থ্য একটি সদা-গতিশীল বিষয় যা পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনীতিকে যেভাবে দেখা হয় সে বিষয়টি, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান ও সর্বোপরি মানুষ বা নাগরিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনধারণের ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্র কীরকম অবস্থান নেয় এ সমস্ত কিছুর ওপরেই নির্ভর করে।

পাবলিক হেলথ-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক মাইকেল মার্মট বলছেন, "দুঃখজনকভাবে গরিব দেশগুলোতে মানুষ অপ্রয়োজনীয়ভাবে মারা যায়। আবার ধনী দেশগুলোতেও যারা সামাজিক সুযোগসুবিধের ক্ষেত্রে প্রান্তিক তাদের মাঝে মৃত্যুহার বেশি।"[২] অন্যত্র বলছেন, "যদি কোনো জনসমষ্টির স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এটা বোঝাবে যে সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন করতে হবে।"[৩] প্রায় একই ধরনের কথা এসেছে আমাদের দেশের ড্রাফট ন্যাশনাল হেলথ পলিসি (২০১৫)-তে। বলা হয়েছে ভারতের জিডিপি-র বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের হেলথ ইক্যুইটির কোনো পরিবর্তন হয়নি।[৪]

স্বাস্থ্য নিয়ে হালের এসব আরেকটু ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের একবার ইতিহাসের পেছন দিকে যাবার প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৫ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ছিল একটি "ভুলে-যাওয়া" বিষয়। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অফ নেশনস-এর চুক্তিপত্র তৈরি করার সময় স্বাস্থ্য বিষয়টি 'ভুলে যাওয়া' হয়েছিল। একদম শেষদিকে বিশ্বের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা উঠল, আর লীগ অফ নেশনস-এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বক্তব্য তৈরি হল। তারই খেই ধরে পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তৈরি হওয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের অঙ্গ হিসেবে তৈরি হল খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।"[৫]—বলেছেন ইভাং (পলিটিক্যাল, ন্যাশনাল অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল লিমিটেশন টু হেলথ কন্ট্রোল)। ইভাং এরপরে বলছেন—কে ভেবেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার তৈরি হচ্ছে তখন স্বাস্থ্য আবার "ভুলে-যাওয়া" বিষয় হয়ে যাবে? ঠিক এটাই ঘটেছিল, এবং ১৯৪৫-এর বসন্তে সান ফ্রান্সিসকোতে "জরুরি ভিত্তিতে" বিশ্ব স্বাস্থ্য-কে আলোচ্য তালিকায় আনা হয়। তিন জন মানুষ সেদিন উদ্যোগ নিয়েছিলেন—ব্রাজিলের তরফে ডাক্তার পাউলা সওজা, চীনের তরফে ডাক্তার জেমিং যে এবং নরওয়ের তরফে ডাক্তার ইভাং স্বয়ং।

স্বাস্থ্যের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারেবারে ভুলে যাওয়া হচ্ছিল কেন? সম্ভবত বাণিজ্য হিসেবে স্বাস্থ্য কী পরিমাণ মুনাফা দিতে পারে তা তখনও অব্দি বহুজাতিক কোম্পানি এবং ইউরো-আমেরিকার দেশগুলোর মাথায় আসেনি। উদাহরণ হিসেবে ২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী, যে অবধি যথেষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্য পাওয়া যায়, ভারত হেলথ কেয়ার এবং আনুষঙ্গিক উপাদান বিক্রির অন্যতম দ্রুত-বর্ধনশীল বাজারকে ধরা যাক। ওষুধপত্রের বিক্রি ১৭.৩% হারে বেড়ে হয়েছে ১৭.৩ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিকভাবে এ বাজার ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলারের, ২০১৭-তে এর পরিমাণ আরও বাড়বে সন্দেহ নেই (IMS Health White Paper, 2016)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তিসম্মত চিকিৎসা এবং মুনাফার মাঝে সবসময়েই "[ওষুধ ইত্যাদি] প্রস্তুতকারীদের যথাযথ ব্যাবসায়িক লক্ষ্য একদিকে, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সামাজিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানগত ও আর্থিক প্রয়োজন আরেক দিকে, ও অন্যদিকে জনসাধারণের সবথেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ওষুধ বাছাই ও ব্যবহারের অধিকার—এদের মধ্যে এক স্বাভাবিক স্বার্থদ্বন্দ্ব আছে।"[৬] বর্তমানে সমস্ত দানবাকৃতি বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফার ১/৩ অংশ খরচ

করে ওষুধ-নামক পণ্যকে বাজারে ভালোভাবে বিক্রয়যোগ্য করে তোলার জন্য। কিন্তু রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা এর মাত্র অর্ধেক খরচ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী হেলথকেয়ার ইন্ডাস্ট্রির মুনাফার সম্মিলিত পরিমাণ ৫.৩ ট্রিলিয়ন ডলার[৭], ২০১৭-তে আরও অনেক বেড়েছে নিশ্চয়ই, যদিও সঠিক তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই।

২০০৫ সালে প্রযুক্তি-নির্ভর মেডিসিনের চাপে পড়ে ব্রাজিলকে প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে। অধুনা গবেষকেরা দেখিয়েছেন, আফ্রিকার যে দেশগুলোতে এবোলা এরকম মারণান্তক চেহারা নিল সে দেশগুলো আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর চাপে জনস্বাস্থ্য খাতে খরচা কমিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর (যেখানে সিটি স্ক্যানার বা এমআরআই কিনতে হয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়েছে। পরিণতিতে এবোলা যখন মহামারীর চেহারা নিয়েছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো পরিকাঠামো এই দেশগুলো হারিয়ে ফেলেছে।[৮]

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ ও বিপুল মুনাফার ধারণা সুস্পষ্ট হয়। সাথে সাথে বদলাতে শুরু করে ১৯৪৫ সাল অব্দি "ভুলে যাওয়া" বিষয়টির চরিত্র। এক নতুন যাত্রাপথ জন্ম নেয়—১৯৭৮ সালের আলমা আটা সম্মেলনের "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এবং "সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা"-র (comprehensive primary health care) বোধ থেকে ২০১৫-তে এসে অতিমাত্রায় বিক্রয়যোগ্য "স্বাস্থ্য পরিষেবা"-র পণ্য বাজারে রূপান্তর।

এখানে তিনটে গুরুতর বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে—

১. "সকলের জন্য স্বাস্থ্য"-র শ্লোগান কী করে মুক্ত বাজারের অর্থনীতির আওতায় চলে এল;

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সংহত ধারণা কীভাবে "বেছে নেওয়া" (selective) স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারণাতে রূপান্তরিত হল, যার ফলে ঝাঁ চকচকে অত্যন্ত দামি পাঁচতারা হাসপাতাল বা নার্সিং হোম "ভালো স্বাস্থ্য"-র সমার্থক হয়ে উঠল; এবং

৩. ক্লিনিক্যাল হেলথ (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও ব্যক্তির চিকিৎসা) এবং পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্যের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য মুছে গিয়ে সমার্থক হয়ে উঠল। একইসঙ্গে মেডিক্যাল শিক্ষাক্রমের ক্রম-রূপান্তর সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে এ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল।

১৯৬০-৭০-এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর একটা বড়ো অংশ ধীরে ধীরে উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এ দেশগুলোকে যেমন মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে; তেমনি, যুদ্ধ-দারিদ্র্য-বুভুক্ষা-দীর্ণ অগণন মানুষের কাছে স্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। ১৯৬৭ সালের একটি গবেষণা দেখাল, অনেকগুলো উন্নয়নশীল দেশ তাদের দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যের সমস্যাকে নিজেদের মতো করে সমাধান করছে, যেমন চীনের খালিপায়ের ডাক্তার।[৯] তানজানিয়া, কিউবা, ভেনেজুয়েলা এবং নাইজেরিয়াতে প্রায় একইরকম পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়ছে। পৃথিবীতে সূচনা হল প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ধারণার। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই মেক্সিকোতে ডেভিড ওয়ার্নার-এর ('যেখানে ডাক্তার নেই' এই সুবিখ্যাত বইটির লেখক) উদ্যোগে তৃণমূল স্তরে গ্রামের সাধারণ মানুষকে শামিল ও প্রশিক্ষিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করার কাজ শুরু হয়েছিল। লাতিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশেই ওয়ার্নারের প্রভাবে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ডেভিড ওয়ার্নার যখন পশ্চিম মেক্সিকোতে স্থানীয় সম্পদ ও জনতাকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের বোধ ও আন্দোলন গড়ে তুলছেন তখন তাঁকে সম্মিলিত ল্যান্ড ব্যাঙ্ক-ও গড়ে তুলতে হচ্ছে দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস করার জন্য। সেসময়ে তাঁর স্বাস্থ্য আন্দোলনের বৃহৎ প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল নাফটা (North American Free Trade Agreement)। নাফটা মেক্সিকো সরকারকে চাপ দিয়েছে যাতে আমেরিকার বীজ ও প্রযুক্তি অবাধে ব্যবহার করা যায়। এ ঘটনা ঘটাতে পারলে জমি ব্যাঙ্ক উঠে যাবে, কৃষক আবার ঋণের জালে জড়াবে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অস্তিত্বও থাকবে না। সাম্প্রতিক সময়ের একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, যখন আমেরিকা ইরাকে যুদ্ধের জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে প্রস্তুত তখন সে এইডস, যক্ষ্মা এবং ম্যালেরিয়ার মোকাবিলার জন্য তৈরি বিশ্ব অর্থকোষে মাত্র ১০০ মিলিয়ন ডলার দেয়।[১০]

একেবারে হালে পৃথিবীর চিকিৎসক মহলে সর্বাধিক পঠিত *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে আমেরিকা

দেশগুলোকে যেমন মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে; তেমনি, যুদ্ধ-দারিদ্র্য-বুভুক্ষা-দীর্ণ অগণন মানুষের কাছে স্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে . . .

থেকে আগত একজন পর্যটকের কাছে কিউবা 'অবাস্তব' এবং 'মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো মনে হয়'—"কিউবার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়। প্রত্যেকের একজন করে পারিবারিক চিকিৎসক আছে। সমস্ত কিছু বিনামূল্যে—কোনো ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির আগাম অনুমোদন ছাড়াই। সমস্ত ব্যবস্থাটি মনে হয় আপাদ-মস্তক উলটে আছে। সমগ্র ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত, এবং প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রিভেনশন-এর ওপরে। যদিও কিউবার অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিতান্ত সীমিত, এর স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা এমন কিছু সমস্যার সমাধান করেছে যা আমাদের ব্যবস্থা এখনও নজর করে উঠতে পারেনি।"[১১]

মোদ্দা বিষয় হল, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৮-এর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ তৈরি হতে থাকে। এসময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওপরে চাপ আসতে থাকে তৃণমূল স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে প্রসারিত করা এবং রোগের ক্ষেত্রে সামাজিক ভূমিকার ব্যাপারে আরও বেশি সক্রিয় হবার জন্য। যদিও সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৯-১৯৫৭ পর্যন্ত সময়ে হু-র সদস্য ছিল না কিন্তু হু-র বাৎসরিক বাজেটের ৬% জোগাত এ দেশটি। ১৯৫৯ সালে সদস্য হবার পরে এর পরিমাণ বেড়ে হয় ১৩%।[১২]

১৯৭৮-এর সনদে উচ্চারিত হয়েছিল—"সত্যিকারের স্বাধীনতা, শান্তি, বৈরিতার অবসান ও অস্ত্রসংবরণ নীতি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য, যথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির নানা কাজ, যার অপরিহার্য অঙ্গ হল জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি, তার জন্য যথাযোগ্য সম্পদ জোগাবে।" এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে যুদ্ধখাতে ব্যয়বরাদ্দ স্বাস্থ্যকে সংকুচিত করে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হলে শান্তির জন্য প্রচেষ্টাও একটি অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যুদ্ধখাতে ব্যয়-বরাদ্দ কমিয়ে জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানোর মতো ঘোরতর রাজনৈতিক বার্তাও ছিল এ ঘোষণাপত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মুশকিল হচ্ছে তেলের এবং খনিজ সম্পদের বাজারের জন্য সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশর অশান্ত হয়ে না উঠলে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির বিপুল মুনাফা হয় না। স্বাস্থ্য এখানে অবান্তর! এজন্য ১৯৭৮-এর সনদপত্র মুক্ত বাজারের প্রবক্তাদের পক্ষে হজম করা অসম্ভব একটি ঘটনা। ২০১৫ সালে *ফরচুন* পত্রিকার সমীক্ষা অনুযায়ী সবচেয়ে লাভজনক প্রথম ১০টি লগ্নির মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবার অবস্থান। ফলে এ প্রবণতাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিহত করার জন্য যুগপৎ আরেকটি শক্তিশালী কার্যক্রম গড়ে উঠল।

পণ্য দুনিয়ার আরেক ইতিহাস

১৯৭৭ সালে এলাইন এনথোভেন মুক্ত বাজারের উপযোগী "উপভোক্তার পছন্দ অনুসারে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা" (Consumer Choice Health Plan)- "এ ন্যাশনাল হেলথ ইন্সিয়োরেন্স প্রোপোজাল বেসড অন রেগুলেটেড কমপিটিশন ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর") তৈরি করলেন। আমেরিকার কার্টার প্রশাসন এটাকে অনুমোদন করল। *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এ ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে "Consumer Choice Health Plan" শিরোনামে দুটো কিস্তিতে প্রকাশিত হল এ লেখা। ১৯৭৯-এর ২৭ ডিসেম্বর *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে দেখাল যে হেলথ কেয়ার কর্পোরেশনগুলোর নীট আয় ১৯৭৯ সালে ৩০-৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৮০ সালে আরও ২০-২৫% আয় বৃদ্ধি প্রত্যাশিত। *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এর প্রাক্তন সম্পাদক রেলম্যান এক প্রবন্ধে জানালেন—১৯৭৯ সালে কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৫ বিলিয়ন ডলার এবং যৌগিক পদ্ধতিতে প্রতি বছরে শতকরা ১৫ ভাগ হারে বাড়বে, উপরন্তু আমেরিকানরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মালিকানা এবং মুনাফার তাগিদে বিশ্বাস করে।[১৩]

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রয়োজনে বিপুল অর্থের বিনিয়োগে নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম হয়েছিল (যার ফলিত চেহারা সিটি স্ক্যানার, এমআরআই ইত্যাদি)। যুদ্ধোত্তর সময়ে এই বিনিয়োগের দীর্ঘকালীন মুনাফা ধরে রাখার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে এ সমস্ত প্রযুক্তি রফতানি নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়ল। উচ্চ প্রযুক্তি-নির্ভর চিকিৎসা (যেমন ক্যান্সার ও হার্টের অসুখ) এক্ষত্রে সবচেয়ে সফল ও কার্যকরী অবস্থা তৈরি করে। অসুস্থ মানুষ মেডিসিনের ও চিকিৎসকের ওপরে নির্ভর করবেই এবং সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যদি প্রযুক্তি-নির্ভর করে তোলা যায় তাহলে অসুস্থতা থেকে নিংড়ে নেওয়া মুনাফা নিয়ে দুশ্চিন্তা কমে যায়। এর পূর্বশর্ত দু-টি—

১.চিকিৎসাকে মুক্ত বাজারের অর্থনীতির আওতায় আনতে হবে এবং সাধারণ জনসমাজকে এই অর্থনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী করে তুলতে হবে,

২.স্বাস্থ্য-র এবং "সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা"-র ধারণাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং "বেছে নেওয়া" (selective) স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

একইসঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পূর্ণত মুক্তও করে ফেলতে হবে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন কীভাবে ১৯৭০ পরবর্তী সময়ে নয়া-উদারবাদী স্বাস্থ্যনীতি "পাবলিক সেক্টর থেকে প্রাইভেট সেক্টরে সম্পদ সরিয়েছে, প্রাপকদের সুবিধা কমিয়েছে, আর গ্রাহক ও কর্মী উভয়েরই অসুবিধা করেছে।"[১৪]

"বেছে নেওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা" (Selective Primary Health Care) শিরোনামে প্রথম লেখা প্রকাশিত হল *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। প্রাথমিকভাবে আলমা-আটা কনফারেন্স-এর প্রতিধ্বনির মতো কিন্তু ভিন্ন যুক্তিক্রম দিয়ে এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা হল। লেখার শুরুতে জানানো হল পৃথিবীর অনুন্নত বিশ্বের ৩০০ কোটি মানুষ "অজস্র ছোঁয়াচে রোগে ভোগে।" বিশ্বব্যাঙ্কের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা-কে উদ্ধৃত করে বলা হল—যে যুগে আমরা ক্রম-হ্রাসমান সম্পদ পাচ্ছি তখন কীভাবে যারা নীচের দিকে আটকা পড়ে আছে তাদের জন্য ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য ও ভালো-থাকা-কে সুনিশ্চিত করতে পারি?[১৫]

পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ডেভিড প্রাইস দেখিয়েছেন "কীভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নীতি তৈরি করে।"[১৬] এসব কিছুই ১৯৭৮-এর সম্মেলনের বিপরীতে ও বৃহৎ ওষুধ কোম্পানি এবং আমেরিকার উপযোগী মুক্ত নয়া-উদারবাদী বাজারের অর্থনীতির সপক্ষে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফ্রিডরিক হায়েক-এর বই *The Constitution of Liberty* (1960, pp. 298-299) স্বাস্থ্যকে বাজারের হাতে তুলে দেবার গোড়াপত্তন করেছিল। শুরু হয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থার রূপান্তর। জন্ম নিল 'অসুস্থতা ফেরি করা' (disease mongering)-এর বিশ্বব্যাপী জাল বিস্তারের সফল, সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক কার্যক্রম।[১৭]

রেলম্যান বলেছিলেন যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক নীতি হবে "এমন এক নীতি যা দামের বিনিময়ে নির্ধারিত মুক্ত বাজারের শক্তিকে

শক্তিশালী করবে।"[১৮] অস্যার্থ, যা ছিল রাষ্ট্রের হাতে তাকে তুলে দিতে হবে মুক্ত বাজারের শক্তির হাতে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ বা আলমা আটা-র ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জনগণের স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। এখন স্বাস্থ্য চলে যাবে বাজারের হাতে। এবং মুক্ত অর্থনীতি ও বাজার যা কেনা-বেচা করবে তা স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য নয়। "স্বাস্থ্য" পর্যবসিত ও রূপান্তরিত হল "স্বাস্থ্য পরিষেবা"-তে। হারিয়ে যেতে থাকল সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারণা।

সর্বাগ্রে UNICEF "সিলেকটিভ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার"-এর ধারণা গ্রহণ করে এবং "বৃদ্ধি পরিদর্শন, ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন, মাতৃদুগ্ধ পান ও টিকাকরণ (Growth monitoring, Oral re-hydration Solution, Breast-feeding and Immunization, সংক্ষেপে GOBI) প্রকল্প গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ফ্রান বম-এর গবেষণাপত্র উল্লেখযোগ্য—"এখনই সকলের জন্য স্বাস্থ্য! একবিংশ শতকে আলমা আটা-র আত্মাকে বাঁচিয়ে তোলা: আলমা আটা-র ঘোষণাপত্রের পরিচিতি।"[১৯]

এছাড়াও, স্বাস্থ্য পরিষেবার মজা হচ্ছে যে যত পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে সে বিনিয়োগকারীর সার্ভিস তত লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হবে। এমনকী সাধারণ মধ্যবিত্ত, মায় দরিদ্র মানুষ পর্যন্ত ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে এই সার্ভিস পাঁচতারা ঝাঁ-চকচকে প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কিনবে। আর পাঁচটা পণ্যের মতো চিকিৎসা-তুল্য বিষয় হয়ে ওঠে কেনাবেচার সামগ্রী আর রোগী হয়ে যায় কনজিউমার বা ভোক্তা। ভারতের প্রসঙ্গে একেবারে হালে *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল*-এ মন্তব্য করা হল—যত বেশি করে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শুকিয়ে যেতে ও হ্রাস পেতে থাকল তত বেশি করে প্রাইভেট সেক্টর সক্রিয় ও কার্যকরী হয়ে উঠল।[২০]

বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টর ইন-ডোর রোগীর ৮০% এবং আউটডোর রোগীর ৬০%-এর পরিষেবা দেয়। স্বাস্থ্যখাতে ৭০ ভাগ খরচ নিজেদের পকেট থেকে মেটাতে হয়, মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে, এক নতুন শব্দবন্ধ তৈরি হয় "মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপ।" ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৫-র খসড়া থেকে আমরা জানতে পারি স্বাস্থ্য পরিষেবার (স্বাস্থ্য নয়, মনে রাখতে হবে) মূল্য চোকাতে গিয়ে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়ে যায় বা দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। প্রাইভেট সেক্টর হাসপাতালের রমরমার জন্য ২০১১-১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতের মোট পরিবারের প্রায় ১৮% "বিপর্যয়কারী খরচ" বহন করতে বাধ্য হয় (২০০৪-২০০৫-এ এ সংখ্যা ছিল ১৫%)। অথচ ভারত এ মুহূর্তে গড় জাতীয় আয়ের নিরিখে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। উল্লেখযোগ্য হল, ভারতের মোট জিডিপি-র মাত্র ১.৪% খরচ করা হয় স্বাস্থ্যখাতে। এই অঙ্ক থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার মতো ছোটো দেশের থেকেও কম। আবার স্বাস্থ্যের জন্য একটাকা বরাদ্দ হলে শেষ অব্দি রোগীর কাছে পৌঁছোয় ১০-১৫ পয়সা। বাকিটা প্রশাসনিক খাতে এবং মাইনে দিতে খরচ হয়।

রাষ্ট্রহীন মানুষেরা যাদের মধ্যে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী, প্রমাণপত্রহীন পরিযায়ী মানুষ অথবা যাদের জন্মের নথিভুক্তি অস্বীকার করা হয়েছে, এদেরকে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান কর্তাব্যক্তিরা "কোনোরকম স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবার আইনি অধিকারবিহীন" বলে মনে করেন।[২১] এই মুহূর্তের বিশ্বে রোহিংগা শরণার্থীদের কথা ভাবুন একবার । মানুষ হিসেবে এরা বেঁচে আছে অথচ স্বাস্থ্যের অধিকার নেই! এ এক বিচিত্র ছলনা—কে নেবে এ সমাধানের দায়িত্ব ?

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে নেওয়া যাক। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে AIIMS-এর মতো প্রতিষ্ঠানের ৫৪% ছাত্র পাড়ি দিয়েছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে।[২২] ২০০৬-এর তথ্যানুযায়ী, ভারতের মোট মেডিক্যাল স্নাতকের (৫৯২,২১৫) ১০.১% বা ৫৯,০৯৫ জন বিদেশে চলে গিয়েছে।[২৩] প্রায় ৬০,০০০ ডাক্তার যারা বিদেশে পসার করেছে তাদের ৪০,৮৩৮ জন আছে আমেরিকায় (আমেরিকার মোট চিকিৎসকের ৪.৯%), ১৫,০৯৩ জন ইংল্যান্ড-এ (মোট চিকিৎসকের ১০.৯%), ২,১৪৩ জন অস্ট্রেলিয়াতে (মোট চিকিৎসকের ৪.০%) এবং ১,৪৪৯ জন কানাডাতে (মোট চিকিৎসকের ২.১%)।[২৪] এ সমস্ত চিকিৎসকেরা কী ভূমিকা পালন করেন। সব দেশের তথ্য না পাওয়া গেলেও আমেরিকার পরিসংখ্যান বলে আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের দিকে যেসব CAH (Critical Access Hospital) আছে সেখানকার প্রতি ৪ জন চিকিৎসকের ১ জন (২৫%) হচ্ছে আমেরিকান নয় এমন, এদের মধ্যে ৬১% হচ্ছে ভারতীয়।[২৫]

এজন্যই ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বিদেশিদের অভিবাসনের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এ লেখা হয় "International Exchange and American Medicine"-এর মতো প্রতিবেদন। বলা হয়—"আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটরা আমেরিকান স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কম সুযোগপ্রাপ্তদের, বিশেষ করে গ্রামীণ ও আদি আমেরিকানদের কাছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌঁছে দিচ্ছে, আর আমেরিকান সেনাবিভাগের প্রাক্তনীদের 'ভেটারেন হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম'-এর মাধ্যমে পরিষেবা দিচ্ছে।" তার সঙ্গে এটাও বলা হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ "আমাদের রোগী ও সহকর্মীদের ক্ষতি করবে, আর বিশ্বে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বদানকারী অবস্থার অবনমন ঘটাবে।[২৬]

মেডিক্যাল শিক্ষার দু-চার কথা

ক্লিনিকে বা হাসপাতালে (সরকারি/বেসরকারি) একক ব্যক্তি বা রোগীর চিকিৎসা, যাকে বলা যায় ক্লিনিক্যাল হেলথ। ২০০৬ সালে দেখা যাচ্ছে—ক্লিনিক্যাল বিষয়ের শিক্ষকদের ওপর 'উৎপাদনশীলতা' বাড়ানোর জন্য চাপ বাড়ছে। অর্থাৎ টাকা দেয় এমন রোগীর চিকিৎসা করে হাসপাতালের রোজগার বাড়াতে হবে।[২৭] অর্থাৎ, মেডিক্যাল শিক্ষাক্রমে কাঞ্চনমূল্যের প্রসঙ্গটি অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—যদি উপার্জন করতে পারে তাহলে শিক্ষকের গুরুত্ব বাড়বে, না

হলে গুরুত্বহীন। ২০১১ সালে এসে আমেরিকায় মেডিক্যাল শিক্ষার বর্তমান চেহারা নিয়ে মন্তব্য করা হল, এটা নিয়তির পরিহাসের মতো যখন মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বছরগুলোতে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীলতা শেখার কথা সে সময়ে ছাত্রেরা অন্যকে আপন ভাবার ক্ষমতা হারাচ্ছে।[২৮] কখন ঘটে এই সহৃদয়তার স্খলন? ডাক্তারি শিক্ষার প্রথম তিন বছরে ছাত্রদের অন্যের কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা যথেষ্ট কমে।[২৯] অন্যত্রও একই কথা বলা হচ্ছে—মেডিসিনের ট্রেনিং-এ বর্তমান মূল লক্ষ্য হল রোগ নির্ণয় করা, রোগীর সামাজিক অবস্থান, চাহিদা বা সক্ষমতাকে বোঝা নয়।[৩০]

প্রশ্ন ওঠে—আমরা কি ডাক্তারি শিক্ষার একটা বুদ্‌বুদ্‌-বাজারে আছি?[৩১] *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল*-এ এক প্রবন্ধে লেখকেরা জানিয়েছেন যে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা যে দামে শিক্ষা কেনে তার চাইতে বেশি দামে বিক্রি করে। বাজার অর্থনীতির চরম প্রভাবে "(চিকিৎসকের) আয়ের তুলনায় শিক্ষাঋণ ক্রমে বাড়তে থাকবে, মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ থেকে হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ থেকে অস্থি-বিশেষজ্ঞ [আর পেরে উঠবেন না] . . . শেষ অবধি ম্যানেজমেন্টের লোক ছাড়া কেউই টিকে থাকবে না।"

একেবারে হালে *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল*-এ এরকম প্রাথমিক চিকিৎসা, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবার সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখে আর্তির প্রতিফলন ঘটছে "Primary Care – Will It Survive?" শিরোনামের প্রবন্ধে। আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন চোখে নিয়ে যে মেধাবী ছাত্র সমাজ মেডিক্যাল শিক্ষার জগতে প্রবেশ করে তারা ক্রমাগত এই অ-মানবিক শিক্ষাক্রম আর হিংস্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বুদ্‌বুদের বাজারের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ যাত্রা করে একজন পরিশীলিত ব্যাবসায়িক চিকিৎসা-পরিষেবা বিক্রেতা হয়ে ওঠে। এ ট্র্যাজেডি কার? ছাত্রদের? সমাজের? চিকিৎসকের? রাষ্ট্রের? নাকি সম্মিলিতভাবে সবার?

ভারতের খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (২০১৫)-তে ৪০ বছর আগেকার সুসংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গ আবার তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রবণতা হল 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' (Health For All)-কে 'সবার মধ্যে স্বাস্থ্য' (Health In All)—এই প্রচেষ্টা দিয়ে কার্যকর করে তোলা (পৃষ্ঠা 16, 4.2.1)। আরও বলা হচ্ছে—সর্বজনীন বিনামূল্যে সুসংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার দিতে হবে; জননতন্ত্রীয়, মা, শিশু ও ছোটো বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, জনগোষ্ঠীতে বেশি আছে এমন সব সাধারণ সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে।"(পৃষ্ঠা 14, 3.3.3)

বাস্তবে এগুলো সব শুভ-ইচ্ছা মাত্র, সেই ১৯৪৬ সাল থেকে ভোর (Bhore) কমিটি যবে তৈরি হয়েছিল সেসময় থেকে একথাগুলোই বারেবারে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্য-কাঠামো রয়েছে ডাক্তার-কেন্দ্রিক, কেন্দ্রাভিমুখী। এজন্য সিভিল সোসাইটির মতামত স্বাস্থ্যনীতি রচনার ক্ষেত্রে কখনো গুরুত্ব পায়নি। *ল্যানসেট*-এর একটি সমীক্ষা দেখায় এর ফলে—"জনস্বাস্থ্য-কর্মী, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা, তাদের কাজের মূল্য দেওয়া ও তাদের ঠিকভাবে কাজে লাগানো—এসবে সামগ্রিকভাবে ঢিলে পড়েছে। উচ্চপ্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ-নিয়ন্ত্রিত হাসপাতাল-ভিত্তিক স্বাস্থ্যপরিষেবার দিকে ঝোঁক বাড়া আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বা প্রমাণ-নির্ভর ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা কমা—এর ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে, বাড়ছে খরচ।[৩২]

আরও কথা হল, বর্তমান সময়ে বাজার-কেন্দ্রিক মুক্ত অর্থনীতি মানুষকে ক্রমাগত বাধ্য করছে উচ্চমূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্রয়ের দিকে যেতে। জন্ম নিচ্ছে "মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপ" এবং "মেডিক্যাল ট্যুরিজম"-এর মতো স্পেস। ইতিহাসের হয়তো বা এক পরিহাসের মতো আলমা-আটা (১৯৭৮) সম্মেলনের পরে কলকাতায় ২০০০ সালে প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে ন্যাশনাল হেলথ অ্যাসেম্বলি-র একটি মিটিং হয়েছিল ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে ১০০০-এরও বেশি স্বাস্থ্য অ্যাক্টিভিস্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বাস্থ্যকে বাজার থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে। একই বছরে ঢাকার সাভারে ৪-৮ ডিসেম্বর পিপলস হেলথ অ্যাসেম্বলি-র প্রথম বা উদ্বোধনী সম্মেলন হয়েছিল। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল হাফডান ম্যালার ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তি অংশগ্রহণ করেননি। স্বাস্থ্য মুক্ত হবার বদলে, মানুষের বেঁচে থাকার একটি মৌলিক অধিকার হবার বদলে ক্রমাগত প্রবেশ করেছে মুক্ত বাজারের অর্থনীতির বেষ্টনজালে, স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি কি পারবে একটি অধুনা-পরিত্যক্ত প্রায় কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সদিচ্ছাকে সামাজিক স্তরে মানুষের অধিকার হিসেবে ব্যক্ত করতে? পারবে দানবিক কর্পোরেট সেক্টর নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের হেলথ কেয়ারের ধারণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যের প্রাথমিক বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে? সদ্য প্রকাশিত বাজেট তো উলটোপথের যাত্রী। সরকারের টাকা, যা আদতে জনগণেরই টাকা, তাই দিয়ে ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির ওপর ভরসা করা হচ্ছে যে তারা বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে (কেবলমাত্র রোগ সারানোর) স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। কেন সরকারি ব্যবস্থা পারেনি, অথচ ওই টাকাতেই বেসরকারি ব্যবস্থা পারবে, সে প্রশ্নটিই তেমন করে কেউ তুলছেন না। আর বেসরকারি উদ্যোগে মুনাফা করাই লক্ষ্য, সেখানে যে প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যের ওপর নজর পড়বে, বা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা হবে, এটা ভাবা যায় না।

যেকোনো চিন্তাশীল মানুষ বুঝবেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা অতি দুর্বল জায়গায় এবং নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে বলে সামান্য জটিল পরিস্থিতিতে রোগীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্র (tertiary centre)-এ রেফারড হয় (অবশ্য চেনাজানা হোমরাচোমড়া বলে দিলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়)। এর ফলে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রের যেমন মুনাফা হয় (প্রাইভেট হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের ক্ষেত্রে) তেমনি সরকারি হাসপাতালগুলোতে এক অসম্ভব চাপ তৈরি হয়। যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার না থাকাও অসম্ভব চাপের একটা

বড়ো কারণ। পরিণতিতে একজন ডাক্তারের পক্ষে—সে জেনারেল ফিজিশিয়ানই হোক বা সুপার-স্পেশালিস্ট হোক—এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। গড়ে রোগী পিছু দু-এক মিনিট করে সময় দেওয়াও কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর শিকার হয় ডাক্তার এবং রোগী উভয়েই। রোগীর মনে বাস্তবসঙ্গত কারণেই এমন ধারণা তৈরি হয়ে যে সে উপযুক্ত নজর ও গুরুত্ব পাচ্ছে না, একটি কেস নম্বর ছাড়া এরকম স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সে আর কিছু নয়। ডাক্তারের ভাবমূর্তি তৈরি হয় মানুষ-বিচ্যুত, রোগী সম্পর্কে উদাসীন এবং উদ্ধত (অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিও বটে) এক না-মানুষ সত্তা। জীবন-মরণকে ঘিরে গড়ে ওঠা এক অতি সংবেদনশীল, নিতান্ত আবশ্যক, ঐতিহাসিক সম্পর্কের করুণ পরিণতির আলেখ্য রচনা হতে থাকে।

এখানে সংবেদী মানুষকে আরেকটি গূঢ়তর সত্য বুঝতে হবে। সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক-অর্থনীতি বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের সামান্য পাঠও আমাদের অবহিত করে যে সামাজিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক সুরক্ষা বা চাকরির সম্ভাবনাহীনতা যখন প্রাধান্যকারী জায়গায় থাকে তখন একদিকে জনমোহিনী রাজনীতির সামান্য অনুদানও জনসমাজ খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায়, আবার অন্যদিকে শূন্যদিশা জনসমাজের প্রবল ক্ষোভ এবং অপূর্ণতা মব ভায়োলেন্স বা গণহিংসার চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ে। স্মরণ করতে পারি সত্যজিতের "জনঅরণ্য", মৃণালের একাধিক ছবি, শ্যাম বেনেগাল বা গোবিন্দ নিহালনি-র বিভিন্ন চলচ্চিত্রের কথা। আমরা দেখেছি নিষ্ফলা ক্রোধ এবং আক্রোশ কীভাবে জনসমাজে প্রতিবিম্বিত হয়। এখানে ডাক্তারকে স্থাপন করলে দেখব সে একজন সফল, ঈর্ষণীয়ভাবে স্বচ্ছল এবং ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এর বিপরীতে রোগীটি আর্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সম্বলহীন এবং ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে থাকা একজন ব্যক্তি মানুষ। একদিক থেকে দেখলে এ দ্বন্দ্ব ক্ষমতা এবং ক্ষমতাহীনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বও বটে। কিন্তু ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও একজন আমলা বা পুলিশ বা শিল্পপতি বা রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ডাক্তারের পার্থক্য হল একজন আমলা বা পুলিশ বা রাজনৈতিক নেতা সরাসরি ক্ষমতাকেন্দ্রের অংশীদার, এর উপাদান। একজন শিল্পপতি বহুলাংশে এদের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু একজন ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং এ অর্থে "ক্ষমতাচ্যুত।" ফলে এরা জনরোষের ক্ষেত্রে একটি নরম লক্ষ্য, এক সফট টার্গেট, যাকে সহজেই আক্রমণ করা যায়, নিজেদের প্রবল ক্ষোভকে সহজে উগড়ে দেওয়া যায় এদের ওপরে। একটি সহজ উদাহরণ হল একজন জনপ্রতিনিধি এয়ারলাইন্সের একজন অফিসারকে আক্ষরিক অর্থে পিটিয়েও দিব্যি মেজাজে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কোনো আইন নেই একে শাস্তি দেবার বা সাধারণ মানুষের সাধ্যি নেই একে ছোঁবার। সংসদে কোনো আইন তৈরি হয় না একে স্পর্শ করার জন্য। বিপরীত চিত্রটি কলকাতায় ঘটে। করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী বৃদ্ধ ডা. আগরওয়ালকে গণপ্রহারে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে গণপ্রহারে নবীন ডাক্তারের মৃত্যুও ঘটে।

আরেকটু তলিয়ে দেখলে চোখে পড়বে, বয়স এবং লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এলে চিকিৎসা পাবে এটা সবার কাছে এতই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং এতই স্বাভাবিকভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদাবোধের মধ্যে পড়ে যে এর কোনো ব্যত্যয় হলে আমরা আহত বোধ করি, উত্তেজিত হয়ে পড়ি। অথচ কলেজ বা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে অসফল হলে এমন কোন বোধ জন্ম নেয় না। ওটাকে মেধার ঘাটতি বলে মেনে নিই। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অন্তর্লীন বোধের সঙ্গে অন্য বিষয়গুলোর মূলগত পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য আমাদের কাছে একটি মূল্যবোধ বলে মনে হয়, এখনও জনমানসে সেভাবেই প্রতিভাত হয়। চিকিৎসক বা ডাক্তারকে গণ্য করা হয় এই মূল্যবোধের ধারক বা ব্যক্তিরূপ হিসেবে। বিশেষ করে বিগত শতকের ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত হতে শুরু করল বাজারের মূল্যমানে, যাকে বিভিন্ন স্তরের মূল্য দিয়ে ক্রয় করা যায়।

কিন্তু চিকিৎসা-প্রত্যাশী মানুষ এবং ইকোনমিক ম্যান তথা কনজিউমার বা ভোক্তার মধ্যেকার প্রভেদ চোখে পড়বে শ্রীনাথ রেড্ডির তুলে ধরা এ কাহিনিটি জানলে। রেড্ডি জানাচ্ছেন রাজেশ বলে একজন ব্যক্তি যথেষ্ট কম মজুরিতে দিল্লির একটি জামা-কাপড়ের দোকানে চাকরি করত। তার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়। তাকে দ্রুত একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানানো হয় চিকিৎসার খরচ

স্বাস্থ্য আমাদের কাছে একটি মূল্যবোধ বলে মনে হয়, এখনও জনমানসে সেভাবেই প্রতিভাত হয়।

পড়বে প্রায় ৫০,০০,০০ টাকা। টাকা দিতে অপারগ রোগীর পরিবার রোগীকে শেষ অব্দি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-এ নিয়ে গেলে রোগীর সেরে ওঠা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ হয় ৬,৫০০ টাকারও কম। রেড্ডি একটি ছোট্ট মন্তব্য করছেন এই অভাবী রোগীর পরিপ্রেক্ষিতে, ". . . সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা না থাকায় এঁকে স্বস্তি দেবার প্রচেষ্টা আটকে যায়।"[৩৩] এ লেখাতেই রেড্ডি জানালেন ভারতে বেসরকারি চিকিৎসার বিপুল খরচ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাসিক আয়ের ২৫-৪০%) মেটাতে গিয়ে প্রায় ৬.৫ কোটি মানুষ ভারতবাসী প্রতিবছর দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। একে বলা হয় "মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপ।"

আমাদের কাছে দু-টি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে—১.অর্থমূল্যের দিক থেকে সরকারি পরিষেবা আর মুনাফা-উৎপাদক বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যেকার ফারাক; ২. universal health coverage বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা না থাকা অভাবী এবং অসহায় মানুষের ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ পরিণাম তৈরি করতে পারে। এই রূপান্তরের এক সুদীর্ঘ

কাহিনি রয়েছে যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, বর্তমান পরিসরে খুব প্রয়োজনীয়ও নয়।

তথ্যসূচি

১. হেলথ: পারসেপশন ভার্সাস অবজার্ভেশনস। *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*; ১৩ এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ৮৬০-৮৬১

২. হেলথ ইন অ্যান আনইকুয়াল ওয়ার্ল্ড। *ল্যানসেট*৩৬৮; ২০০৯, পৃ. ২০১৮

৩. সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ ইনিকুয়ালিটিস। *ল্যানসেট*, ৩৬৫; ২০০৫, পৃ. ১০৯৯

৪. ন্যাশনাল হেলথ পলিসি পৃ. ১.১, ২.১-৪

৫. K. Evang. Political, national and traditional limitations to health control; *Health of Mankind, 1967*, pp. 196-211

৬. WHO. Clinical Pharmacological Evaluation of Drug Control, 1993

৭. WHO. World Health Report: 2010.

৮. রবিনসন ও ফাইফার. The IMF's Role in the Ebola Outbreak – The Long- Term Consequences of Structural Adjustment; Bretton Woods Project, 2015

৯. Amor Benyoussef, Barbara Christian. Health care in developing countries; *Social Science and Medicine 1967*, 11: 399-408

১০. John H Hall, Richard Taylor. Health for all beyond 2000: the demise of the Alma-Ata Declaration and primary health care in developing countries; *Medical Journal of Australia* 178 (2003): 17-20)

১১. Edward Campion, Stephen Morrissey. A Different Model – Medical Care in Cuba; *NEJM* 2013, 368(4): 297-299

১২.Anne-Emmanuel Birn. The stages of international (global) health: Histories of success or successes of history? *Global Public Health 2009*, 4(1): 50-68

১৩. Arnold Relman. The New Medical-Industrial Complex; *NEJM* 1980, 303(17): 963-970

১৪. Mimi Abramovitz, Jennifer Zelnick. Double Jeopardy: the impact of neoliberalism on care workers in the United States and South Africa; *International Journal of Health Services 2010*, 40 (1): 97-117

১৫. Julia A. Walsh and Kenneth S. Warren. Selective Primary Health Care: An Interim Strategy for Disease Control in Developing Countries; *NEJM* 1979, 301(18): 967-974

১৬. How the World Trade Organization is shaping domestic policies in health care. *Lancet* 354 (1999): 1889-92

১৭. Ray Moynihan, Allan Cassels. Selling Sickness: How Drug Companies Are Turning Us All Into Patients; 2005

১৮. The Allocation of Medical Resources. *Journal of Medical Education; 1979*, 55: 99-104

১৯. Health for All Now! Reviving the spirit of Alma Ata in the twenty-first century: An Introduction to the Alma Ata Declaration. *Social Medicine*, 2007, 2: 34-41

২০. K. Srinath Reddy. India's Aspirations for Universal Health Coverage; *NEJM* 2015, 371 (1): 1-5

২১. What does universal health coverage mean? *Lancet*, January 18, 2014, pp. 277-279

২২. High-end physician migration from India. Bulletin of the World Health Organization 86 (2008): 40-45

২৩. Fitzhugh Mullan. Doctors For the World: Indian Physician Emigration; *Health Affairs* 25.3 (2006): 380-393

২৪. Fitzhugh Mullan. The Metrics of the Physician Brain Drain; *NEJM* October 27, 2005: 1810-1817

২৫. The role of international medical graduates in America's small critical access hospitals. *Journal of Rural Health*, 20.1 (2004): 52-58

২৬. International Exchange and American Medicine. *NEJM* February 1, 2017: pp. 1-2

২৭. American Medical Education 100 Years after the Flexner Report. *NEJM* 355 (2006): 1339-44

২৮. Into the Waters – Clinical Clerkships. *NEJM* 364: 1190-92

২৯. Is There Hardening of the Heart during Medical School? *Academic Medicine*, 83 (2008): 244-289

৩০. Patient- and Family-Centered Medical Education: The Next Revolution in Medical Education? *Annals of Internal Medicine*, 2014, 161 (1): 73-75

৩১. Are We Living in a Medical Education Bubble Market? *NEJM* 2013, 364: 300-301

৩২. K. Srinath Reddy et al. Towards achievement of universal health care in India by 2020: a call to action; *Lancet* February 26, 2011: 760-768

৩৩. K. Srinath Reddy. India's Aspirations for Universal Health Coverage; *New England Journal of Medicine* 373.1 (2015): 1-5 স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এমবিবিএস, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে পিএইচ ডি করেছেন। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সমাজ ও তাদের সম্পর্ক নিয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষক।

এই লেখাটির তাঁর আন্তর্জালে *News Britant*-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। আন্তর্জালের সেই লেখাটি পড়তে ক্লিক করুন http://www.newsbritant.com/2018/01/18/kck-health-care/

হরেকরকম

ভাইরাস সংক্রমণের পর কতদিন রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত?

এক-এক ভাইরাসের জন্য রোগীর এই সংক্রামক অবস্থার স্থায়িত্ব এক-এক রকম।

সাধারণভাবে ভাইরাসঘটিত রোগে অসুস্থ বোধ করার পরে, বা গায়ে ভাইরাসঘটিত র‍্যাশ বেরোনোর পরে, রোগী অন্যের জন্য সংক্রামক হয়ে ওঠে। তবে সবসময় তা সত্যি নয়।

❐ জলবসন্তের ক্ষেত্রে কিন্তু র‍্যাশ বেরোনোর দু-দিন আগে থেকেই রোগী সংক্রামক হয়ে পড়ে, আর র‍্যাশ বেরোনোর দিন পাঁচ-সাত পর পর্যন্ত রোগী সংক্রামক থাকেন। আমাদের দেশে ধারণা আছে যতদিন গায়ে র‍্যাশ থাকবে ততদিন রোগী সংক্রামক, এটা ভুল ধারণা। অনেকের ধারণা জলবসন্তের জলভরা গোটার মামড়িগুলো খুব ছোঁয়াচে, তাই সেই মামড়ি আগুনে পুড়িয়ে তবে তাঁদের শান্তি—এটাও ভুল ধারণা।

❐ সাধারণ সর্দির ভাইরাস কিন্তু রোগীর শরীর থেকে বেরোতে শুরু করে রোগীর রোগলক্ষণ ফুটে বেরোবার দু-চারদিন আগে থেকেই, আর যতদিন শরীরের সব রোগলক্ষণ না যাচ্ছে ততদিন এই ভাইরাস শরীর থেকে বেরোয়—এই পুরো সময়টা জুড়েই তাই রোগী সংক্রমণ ছড়াতে থাকে। সব মিলে মোটামুটি দু-সপ্তাহ; তবে রোগলক্ষণ যখন সবচেয়ে বেশি, রোগের লক্ষণ দেখা দেবার প্রথম দু-তিন দিন, তখনই এই রোগ সবথেকে বেশি ছড়াতে পারে।

❐ ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে রোগলক্ষণ শুরু হওয়া থেকে তিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত রোগী সংক্রামক থাকে। মোটের ওপর বাচ্চা, বুড়ো আর অন্যভাবে অসুস্থরা ফ্লু-তে বেশিদিন ভোগে, আর ভাইরাস ছড়ায়ও বেশিদিন ধরে, তাই তারা বেশিদিন, এমনকী সাতদিনেরও বেশি সময় ধরে, সংক্রামক থাকতে পারে।

❐ হাম বা মিজলস খুব সংক্রামক ব্যাধি, আর আমাদের দেশে অপুষ্ট শিশুদের ওপর হামের আক্রমণ খুবই মারাত্মক। হামের ভাইরাস শরীরে ঢুকে রোগলক্ষণ তৈরি করলে প্রথমে দেখা যায় গায়ে ব্যথা, অখিদে, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ও আলোয় কষ্ট, সর্দিজ্বর। এসব লক্ষণ অনেক রোগেই হয়, তাই এইসব দেখে হাম হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। মুশকিল হল, এমন অবস্থাতেই হাম সবথেকে বেশি ছোঁয়াচে, আর হামের টিপিক্যাল লাল-লাল র‍্যাশ গায়ে বেরোনোর আগেই ছোঁয়াচেভাব অনেক কমে যায়। র‍্যাশ বেরোনোর দু-দিনের মধ্যে রোগী আর সংক্রামক থাকে না।

❐ মাম্পস রোগে গাল ফুলে যায়। আসলে আমাদের গালের চামড়া আর মাংসের তলায় কানের সামনে থাকে প্রধান লালাগ্রন্থি, সেটা আক্রান্ত হয়। এই লালাগ্রন্থি ফোলা শুরু হবার দু-চারদিন আগে থেকে মাম্পস রোগী সংক্রামক হয়ে পড়ে, আর তার কিছুদিন পরে মাম্পস রোগী সংক্রামক থাকে না।

❐ রুবেলা বা জার্মান হাম আমাদের দেশে তত বেশি দেখা যায় না, আর তত মারাত্মক ব্যাধিও নয়। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের এই রোগ হলে গর্ভস্থ ভ্রূণের খুব ক্ষতি হতে পারে, তাই বিশেষ করে প্রজননক্ষম বয়সের মেয়েদের এই রোগীর কাছে ঘেঁষতে না দেওয়াই উচিত। রুবেলার র‍্যাশ বেরোনোর একসপ্তাহ আগে থেকেই রোগী সংক্রামক থাকে, আর র‍্যাশ বেরোনোর দিন-চারেক পর পর্যন্ত সংক্রামক দশা কাটে না।

❐ হারপিস জস্টার রোগ আর জলবসন্ত রোগের কারণ একই ভাইরাস। তাই হারপিস জস্টার-এর র‍্যাশ বেরোনো থেকে ১০-১৪ দিন পর, র‍্যাশ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, রোগীকে এমন কারও কাছে

হাম বা মিজলস খুব সংক্রামক ব্যাধি, আর আমাদের দেশে অপুষ্ট শিশুদের ওপর হামের আক্রমণ খুবই মারাত্মক।

যেতে দিতে নেই যার জলবসন্ত হয়নি বা জলবসন্ত রোগের টিকা নেওয়া নেই। আমাদের দেশে বড়োদের জলবসন্ত হয়েই গেছে এমন ধরে নেওয়া হয়, তাই জলবসন্ত টিকাকরণ হয়নি এমন বাচ্চাদের কাছ থেকে হারপিস জস্টার রোগীদের এই ১০-১৪ দিন আলাদা রাখা হয়।

❐ টনসিলাইটিস সাধারণত প্রথমে ভাইরাস থেকেই হয়, যদিও পরে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। টনসিলাইটিসের ভাইরাস নানারকম হয়, তাই শুধু টনসিলাইটিস হয়েছে এটুকু জেনে সংক্রামক অবস্থা কতদিন থাকবে তা বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে রোগী সাত-দশ দিন সংক্রামক থাকবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের জনশিক্ষামূলক ওয়েবসাইট। বিশদে পড়তে ক্লিক করুন—https://www.nhs.uk/chq/Pages/1068.aspx?CategoryID=87&SubCategoryID=876

হরেক রকম

মদ খেলে সেটা কতক্ষণ শরীরে থাকে ও নেশার অবস্থা বজায় রাখতে পারে?

১০ মিলিলিটার (প্রায় ৮ গ্রাম) বিশুদ্ধ অ্যালকোহল হল এক ইউনিট অ্যালকোহল। কিন্তু মদ তো আর কেউ বিশুদ্ধ অ্যালকোহল হিসেবে খায় না, খায় হুইস্কি, রম, বিয়ার, বা ধেনো, চোলাই, এইসব নানা আলাদা আলাদা রূপে। এদের প্রতিটিতে অ্যালকোহল-এর পরিমাণ আলাদা। তার ওপর মদ প্রায়ই জল মিশিয়ে খাওয়া হয়। তবু কতটা মদ খাওয়া হয়েছে, এই হিসেব করতে অ্যালকোহলের এই ইউনিট ছাড়া চলেও না।

এক ইউনিট অ্যালকোহলকে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ফেলতে শরীরের মোটের ওপর একঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু আরও কিছু ব্যপার খতিয়ে দেখতে হয়। সেগুলো হল—

মদ্যপায়ীর ওজন কত?

তিনি পুরুষ না মহিলা?

তাঁর বয়স কত?

তাঁর বিপাক ক্রিয়ার হার কেমন? দ্রুত না মন্থর?

কতটা খাবার খাওয়া হয়েছে?

কোন অ্যালকোহল ও কীরকম ঘন তা?

আর কোনো ওষুধ চলছে কিনা?

আবার লিভার যদি ঠিকমতো কাজ না করে তো মদ শরীরে ভেঙে অন্য পদার্থে পরিণত হতে সময় বেশি লাগবে।

কতটা মদে এক ইউনিট অ্যালকোহল থাকে?

ওয়াইন (১২% অ্যালকোহল) হলে এক গ্লাসে (১৭৫ মিলি) দু-ইউনিটের একটু বেশি থাকে

সাধারণ বিয়ার (৩.৬%)-এর এক পাঁইটে দু-ইউনিট।

রম বা হুইস্কিতে এক পেগ-এ (২৫ মিলি) এক ইউনিট।

একাধিক রকমের মদ খেলে সেগুলো মোট যত ইউনিট হচ্ছে তা যোগ করতে হবে।

এক গ্লাস ওয়াইন বা এক পাঁইট সাধারণ বিয়ার খেলে দু-ইউনিট খাওয়া হল, আপনার শরীর সেটাকে ভেঙে ফেলতে সময় নেবে দু-ঘণ্টা। কিন্তু এটা মোটা দাগের হিসেব।

মেয়েদের শরীরে অ্যালকোহল ভাঙে তুলনায় আস্তে আস্তে। খালিপেটে অ্যালকোহল খেলে তা দ্রুত পেট থেকে রক্তে চলে যায় ও হঠাৎ নেশা হয়ে যায়। কয়েকটি ওষুধ অ্যালকোহল ভাঙার হার কমিয়ে দেয়, আবার কিছু ওষুধ তা বাড়িয়ে দেয়।

আবার, এক সন্ধ্যায় বসে অনেক সময় ধরে অনেকটা অ্যালকোহল খেলে তখনকার মতো ভয়ানক রকম নেশা হয় না হয়তো, কিন্তু সেই মদ পরদিনও শরীরে থেকে যেতে পারে। এমনকী পরদিন সকালে গাড়ি চালানোর সময় এর জন্য বিপদ হতে পারে, অথবা পুলিশ আপনাকে ধরলে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্য কেস দিতে পারে।

এক সপ্তাহে কতটা অ্যালকোহল খাওয়া ডাক্তারি মতে বিপজ্জনক নয়?

মদ খাবার ‘নিরাপদ মাত্রা’ বলে কিছু হয় না। মদ খেলেই তা ক্ষতিকর, শুধু বেশি খেলে ক্ষতি বেশি, কম খেলে ক্ষতি কম।

আপনি যদি প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই মদ খান, তাহলে এক সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি খাবেন না। আর সেটাও একদিনে বসে কখনোই খাবেন না। সারা সপ্তাহে তিন-চার দিনে খেলে শরীরে ক্ষতি কম, আর আপনারও বেহেড মাতাল হবার সম্ভাবনা কম।

আগে ডাক্তাররা মনে করতেন যে স্বল্প পরিমাণে মদ হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ভালো। কিন্তু এখন আর তা মনে করা হয় না।

গর্ভবতী মায়েদের মদ একেবারে পরিত্যাজ্য।

১০-২০ বছর ধরে সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের চাইতে বেশি মদ খেলে যে রোগগুলো হতে পারে সেগুলো হল—

মুখ, গলা ও স্তনের ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, লিভারের রোগ, মস্তিষ্কের ক্ষতি, স্নায়ুতন্ত্রের সর্বত্র ক্ষতি।

যত বেশি মদ খাবেন ক্ষতির সম্ভাবনা তত বেশি, ক্ষতির পরিমাণও তত বেশি। সুতরাং আপনি যত কম মদই খান না কেন, তা আরও কমান। ছেড়ে দিতে পারলে সবথেকে ভালো।

আর মোট কতটা খাচ্ছেন সেটা যেমন হিসেবে আনতে হবে তেমনই একবারে বসে কতটা খাচ্ছেন তাও হিসেবে রাখতে হবে। একবারে বসে যদি বেশি মদ খান, বিশেষ করে সেটা যদি দ্রুত খান, তো নানা অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা খুবই বাড়ে। খেতেই যদি হয় ধীরেসুস্থে খান, বেশি করে জল খান, পেটে যেন খাবার থাকে (সেগুলো বেশি ভাজাভুজি না হওয়াই ভালো), আর অতি অবশ্যই বেহিসেবি বেশি খাবেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের জনশিক্ষামূলক ওয়েবসাইট। বিশদে পড়তে ক্লিক করুন—https://www.nhs.uk/chq/Pages/853.aspx?CategoryID=87&SubCategoryID=871

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব তেরো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

ভুবনদিদির সঙ্গে কয়েকটা দিন ইচ্ছে করে দেখা করিনি, পাছে তিনি আমায় ফের টাকা ধার দিতে আসেন—এই ভয়ে। তিনি আমার মনের ইচ্ছেটা ঠিক আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। সে-জন্যে মেয়ের হাত দিয়ে আমাকে একটা চিঠি পাঠালেন: ‘জানি তুমি কেন দেখা করতে আসছ না। তুমি যা ভাবছ, সেজন্যে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছি না। এসো কিন্তু, না কোরো না।’ ওঁর মেয়ের সঙ্গে গেলাম। মুখে একগাল হাসি, আমার হাত ধরে তিনি ঘরে ঢুকলেন, বললেন: ‘যদি জানতাম তোমার মনে এতটা ঘা লাগবে—বিশ্বাস কর—তাহলে টাকা ধার দেওয়ার কথা তুলতামই না। তবে আজ তোমাকে আমি অন্য একটা কাজের কথা বলব। অবশ্য জানি না, সেটাও তোমার খারাপ লাগবে কিনা।’ আমি বললাম: ‘আপনার মনে কী আছে, খুলেই বলুন না। বলছেন না কেন?’ তিনি একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন: ‘একটা কাজের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।’ আমি একটু অস্থির হয়ে বললাম: ‘তা খোলসা করেই বলুন না, বলুন কী কাজ?’ তিনি বললেন: ‘আমার শ্বশুরের একটা মেয়েদের স্কুল আছে। তুমি রাজি থাকলে সেখানে একটা মাস্টারনির কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।’ আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

না চাইতেই এমন একটা সুযোগ এসে গেল। ভুবনদিদির দেওয়া এই অযাচিত সুযোগটা নেব কি নেব না ভাবতে গিয়ে আমি কেমন একটা দোটানায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ভুবনদিদির চোখেমুখে যে আকুতি, যে কাকুতি-মিনতি ঝরে পড়ছিল তাতে আমার ভাবনায় বাধা পড়ল। মনে কিছুটা শঙ্কা নিয়ে বললাম: ‘এ তো বেশ ভালো কথা। বেশ তো, আপনি যা ঠিক করেছেন তার ব্যবস্থা করুন গে।’ সেদিনই তিনি বিশুবাবুকে দিয়ে স্কুল কমিটির মেম্বারদের খবর পাঠালেন: ‘আমার বন্ধু, এই মহিলা উচ্চশিক্ষিত। তিনি অনুগ্রহ করে মেয়েদের পড়াতে রাজি হয়েছেন, সঙ্গে সেলাইও শেখাবেন। মহিলা বেনারসবাসী। সামান্য টাকা মাইনে পেলেই ওঁর চলে যাবে। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে দিলেই ওঁকে আপনারা কাজে লাগাতে পারেন। আমি চাই ওঁ কাল থেকেই কাজ শুরু করুক। পুরুষেরা মেয়েদের খুব একটা ভালো মাস্টারমশাই হন না; সেজন্যেই আমি ওঁকে নিয়োগ করতে চাই।’ স্কুল কমিটির মেম্বার ছিলেন ঢাকা-র সীতানাথবাবু, মুঙ্গের-এর চারুচন্দ্রবাবু, বিশুবাবু, জয়বাবু, কৈলাস ভট্টাচার্য, রাধাচরণ দত্ত, বটুক পাণ্ডে, রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জী ও আরও কয়েকজন। ভুবনদিদির চিঠি পেয়েই ওঁরা তাঁকে লিখলেন: ‘আপনি যাঁর কথা লিখেছেন, তাঁকে কালকেই পাঠিয়ে দিন। যিনি এই পদে এখন কাজ করছেন, তাঁকে হয়তো এক মাসের মাইনে বাড়তি দিতে হবে।’ দিদি জবাব দিলেন: ‘সেটাই করুন।’

পরের দিন ভুবনদিদি মেয়েদের সঙ্গে আমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, এক বৃদ্ধ কায়স্থ ভদ্রলোক সেখানে পড়াচ্ছেন। আমি হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলাম, বললাম: ‘আপনাকে সাহায্য

করার জন্যে ভুবনমোহিনী দেবী আমাকে পাঠিয়েছেন।' বিরক্তিতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল, বললেন: 'আচ্ছা, আচ্ছা, এসো, মন দিয়ে কাজ করো।' আমি কয়েকটি মেয়েকে পড়ালাম, আর কয়েকটিকে সেলাই-করা শেখালাম। আমি ভুবনদিদির মেয়েকেও পড়াতাম। ও বলেছিল: 'মাসি, তুমি আমাকে রোজ পড়াবে।' আমি জবাব দিলাম: 'পড়াব বাছা, পড়াব। এর থেকে ভালো কথা আর কী হয়?' সেদিন বিকেলে যখন স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, আমি বৃদ্ধকে জিগেস করলাম: 'কাকা, মেয়েদের কি নামতা শেখানো হয় না?' তিনি জবাব দিলেন: 'কে শেখাবে নামতা?' বললাম: 'আপনি অনুমতি দিলে আমি শেখাতে পারি।' তিনি বললেন: 'তা তো তুমি বলবেই। এখানে এসেছ তো আমার কাজের বোঝা বাড়াতে। শোনো মেয়ে! এখানে ক-দিন আর তুমি টিকবে? শুধু শুধু জঞ্জাল বাড়িয়ে আর কী লাভ?' আমি হাসতে হাসতে বললাম: 'তা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো এখানে এসেছি ভুবনদিদির অনুরোধে।' 'সে কথা কি আমি আর জানি না? সুন্দর মুখের সঙ্গে কে আর টক্কর দিতে পারে! এমনকী বাবুদেরও হাত করে ফেলেছ। যা

. . . অভাগা মানুষটি ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সম্পর্কে আজগুবি সব কেচ্ছা-কেলেংকারি চারদিকে রটাতে লাগলেন। . . . কমিটির বাবুরা এক ভ্রষ্টা মেয়েকে মাস্টারনি করে এনেছে। ও-ই নাকি তাঁদের সব চাহিদা মেটাবে।'

করলে তুমি, তাতে আমার চাকরিটা খোয়া গেল। একটা বুড়ো মানুষ আমি। এখানকার সামান্য মাইনেতে কোনোমতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে পারছি। এখন সেটাও গেল।' এ কথা শুনে আমি বেশ মর্মাহত হলাম, তাঁকে আমার খেদের কথা জানিয়ে বললাম: 'কাকা, এতে আমার কিন্তু কোনো দোষ নেবেন না। আমি এসেছি ভুবনদিদির অনুরোধে। কমিটির বাবুদের আমি চোখেও দেখিনি, কানেও শুনিনি।' তিনি আমার কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করলেন না।

অভাগা মানুষটি ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সম্পর্কে আজগুবি সব কেচ্ছা-কেলেংকারি চারদিকে রটাতে লাগলেন। আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারের ধরন: 'এই স্কুলে কেউ মেয়েদের পড়তে পাঠাবে না। স্কুলের বারোটা বেজে যেতে আর বেশি দেরি নেই। কমিটির বাবুরা এক ভ্রষ্টা মেয়েকে মাস্টারনি করে এনেছে। ও-ই নাকি তাঁদের সব চাহিদা মেটাবে।' এইভাবেই তিনি মুখে আনা যায় না, এইরকম সব যাচ্ছেতাই খারাপ খারাপ কথা আমার নামে বলে বেড়াতে লাগলেন। পিসেমশায় একদিন আমাকে জানালেন। বললেন: ' আমি যখন প্রথম এ কথা শুনি রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে উঠেছিল। পরে ভাবলাম, ধুর এসব কথায় পাত্তা দিতে নেই। পড়শিরা বুড়ো মানুষটির ওপর খুবই খেপে আছেন। যেখানেই তিনি এই নোংরা-গুজব রটাতে যান, পড়শিরা তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। ওঁরা তাঁকে বলেন: "মেয়েটির নামে খামোখা বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি বদনাম তুমি রটাচ্ছ কেন? আমরা কি ওকে জানি না, না চিনি না? পড়শিরা সকলেই ওঁকে ভালো করে জানে। শোনো, নষ্ট মেয়েমানুষের হাবভাবই আলাদা। এই মেয়েটি চুলে তেল দেয় না, পান খায় না, রোজ নিজের ভাত ফুটিয়ে খায়। ওর সম্পর্কে খবরদার আর একটাও খারাপ কথা বলবে না। ও তোমার মতো নোংরা মনের মানুষ নয়।" '

আমি ভুবনদিদিকে এইসব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন: 'এইসব কথায় কান দিও না তো। মানুষ পরনিন্দা, পরচর্চা করতে ভালোবাসে। কেচ্ছা-কেলেংকারির ভেতরে যদি কোনো সত্যতা না থাকে, তবে মিথ্যের বেসাতি বেশিদিন চলে না, একদিন-না-একদিন ফাঁস হয়ে যায়ই। আমি সব শুনেছি।

পুরুতঠাকুরানী সব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন: 'তুমি ওই জঘন্য পচা কাজটা নিয়েছই-বা কেন? তুমি এসেছ বেনারসে। এই পবিত্র ভূমিতে অনেক লোকে ভিক্ষে করেই তো খায়— তাতে অন্যায় কিছু নেই, অসম্মানও কিছু নেই। তুমি শুধু শুধু কেন তোমার সুনাম-মর্যাদা খোয়াবে?' আমি বললাম: 'খুড়িমা, আমি যে ভিক্ষে করতে পারি না। আর যেহেতু আমার মাথার ওপর কেউ নেই; আমি যাই করি না কেন, লোকে আড়ালে আমাকে নিয়ে পাঁচ কথা বলবেই। তুমি ভেবে ভেবে অত মন খারাপ কোরো না তো খুড়িমা। ভগবান আছেন আমাকে দেখবেন। যত দিন যাবে এসব গুজগুজ-ফুসফুস একদিন ঠিক থেমে যাবে। যার মাথার ওপর আপনার মতো মমতাময়ী মা, ভুবনদিদির মতো মিতে আর আপনার স্বামীর মতো একজন আচার্য অভিভাবক রয়েছে; তার আবার কীসের ভয়, খুড়িমা? আমি দোরে দোরে ভিখ মাঙতে পারব না। হাত-পা-চোখ-কান যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ তো কোনোমতেই নয়।' খুড়িমা দেখলেন: আমি যা ঠিক করে ফেলেছি তার আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। আর কথাটি না বাড়িয়ে চুপ করে রইলেন। জানি না, তখন মনে-মনে তিনি কী ভাবছিলেন। মনটাকে শক্ত করে ঠিক করে নিলাম, লোকে যা খুশি-তাই বলে বলুক, ওদের কোনো কথায় পাত্তা দেব না। যাঁদের সঙ্গে আমি

স্কুল থেকে যেদিন মাইনে পেলাম, কী যে আনন্দ হল। আনন্দে চোখে জল এসে গেল। খুড়িমার হাতে টাকাটা তুলে দিতে পেরে আমার কী সুখ, কী সুখ!

মেলামেশা করি, তাঁরা আমার নিন্দুকদের থেকে অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত ও সর্বজনমান্য। আমার সম্মান ও সুকৃতি রক্ষার দায় নিয়েছেন এইসব মান্যগণ্য মানুষজন। পিসেমশাই আমার আত্মার মঙ্গলচিন্তায় বিভোর। আর পিসিমা তো আমার আর-একজন মা-ই। যে অকৃপণ ভালোবাসা তাঁর কাছে পেয়ে এসেছি, তা কি মাপা যায়?

স্কুল থেকে যেদিন মাইনে পেলাম, কী যে আনন্দ হল। আনন্দে চোখে জল এসে গেল। খুড়িমার হাতে টাকাটা তুলে দিতে পেরে আমার কী সুখ, কী সুখ!

বিকেলে খুড়িমা আমাকে কিছু নাড়ু, চিড়ে-মুড়ির মোয়া খেতে দিলেন। আমি খুব তৃপ্তি করে সেগুলি খেলাম, কিছু তাঁকেও দিলাম। পরদিন সকালে তিনি আমার জন্যে কিছু আলু আর ঘি নিয়ে এলেন। কিন্তু দিনে একাহারী থাকার অভ্যেসটি আমি ছাড়িনি। এই চাকরিতে আট মাস টিকে ছিলাম। ভাবলাম, যদি আরও লেখাপড়া শিখতে পারি, তাহলে আরও ভালো কাজ পাওয়ার সুযোগ পেতে পারি। আরও বেশি শেখবার-জানবার জন্যে আকুলি-বিকুলি জীবনভর আমার সাথি। ভুবনদিদিকে বললাম: 'দিদি, আমি যদি দু-একটা পরীক্ষায় পাশ দিতে পারি, তাহলে স্কুলটাকে আর অনেক ভালো লেখাপড়ার জায়গা বানিয়ে তুলতে পারব।' তিনি বললেন: 'তোমার যা ইচ্ছে।' আমি ফের নিজের জীবনে দুঃখকষ্টকে সেধে সেধে ডেকে আনতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। উচ্চশিক্ষার জন্যে আমার এই আকুলতা জীবনে আরও কত দুঃখকষ্ট বয়ে আনবে কে জানে। গোটা জীবনটাই তো কেটেছে চরম দুর্দশায়, দুর্বিপাকে। আর কী এমন দুঃখকষ্ট আছে, যে আমি ভয় পাব! এইরকম ভাবতে ভাবতেই আমি ইস্তফা দিয়ে দিলাম।

যেদিন ইস্তফা দিলাম, সেদিনই ভুবনদিদির ধর্মছেলের বাড়ি থেকে লোকজন ভুবনদিদিকে নিয়ে যেতে এসেছে। সেখানে তাঁর আত্মীয়-কুটুমরা সব কলেরায় ভুগছেন। একজনও এমন কেউ নেই যে তাঁদের একটু সেবা-শুশ্রূষা করেন। দিদি আমাকে নিয়ে এক্কায় করে রাজঘাট গেলেন। গিয়ে দেখলাম: ছোটো ছেলের বউ, তার দুই মেয়ে, ভাশুরের ছেলে—সব কলেরায় পড়েছে। কেবল ভাশুর আর বড়ো-জা-কে এখনও রোগে ধরেনি। এখানে আমি আগে এসেছিলাম, এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছিল।

টানা তিন-চারদিন আমরা দু-জনে আমাদের সাধ্যমতো ওদের সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুললাম। ভাশুর আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমাকে তিনি বললেন: 'বোন, বিনিময়ে তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?' লজ্জা পেলাম, অস্বস্তিও হল, বললাম: 'দাদা, সাহায্যের দরকার হলে আমি নিজেই আপনাকে জানাব।' বলে বাড়ি ফিরে এলাম। স্কুলে গেলে, আমাকে জানানো হল, আমার পনেরো দিনের টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কেননা আমি স্কুলকে কিছু না-জানিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমি মেনে নিয়ে পনেরো দিনের মাইনে হাতে করে ঘরে ফিরে এলাম।

সঙ্গে দুটো চিঠি নিয়েছিলাম: একটি দুর্গামোহন দাশকে শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়ের লেখা, আর-একটি বাবু চারুচন্দ্র মিত্রর লেখা শিবনাথ শাস্ত্রীকে।* এখন আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা—কীভাবে কলকাতা যাব?

রেলে কাজ করেন আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা। সেই তারাপ্রসন্ন দাদাকে লিখলাম: 'যে-করেই হোক আমাকে একটা রেলের পাশ জোগাড় করে দাও, তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।' তিনি জবাব দিলেন: 'পনেরো দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।' আরও লিখলেন: 'আমার ভাগনে বাড়ি ফিরছে। তুমি ওর সঙ্গে যেতে পারো। ও প্রথমে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, তারপর নিজের বাড়ি ফিরবে।' বন্দোবস্তটা আমার বেশ মনে ধরল।

একদিন ভুবনদিদি বললেন: 'চল একটু বিশ্বেশ্বর-মন্দির ঘুরে আসি।' আমরা মন্দিরের পথে হাঁটছি, এমন সময় আশি বছরের এক বুড়ো আমার পিছু ধরল, বলল: 'বাঃ! খাসা জিনিস তো, খেতে বেড়ে লাগবে।' খুড়িমা আমার থেকে কয়েক কদম এগিয়ে ছিলেন। বুড়ো ছিল আমাদের পিছনে। আমি পেছন ঘুরে বুড়োকে বললাম: 'তুমি কি রাক্ষস না কী? না হলে আস্ত একটা মানুষ চিবিয়ে খেতে

আমি বললাম: 'বাবা, কিন্তু আমি তো পড়াশোনা করতে যাচ্ছি।' তিনি জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ, মা, তুমি যেখানেই যাও, ঘর-সংসার তোমার হবে।'

চাও কোন আক্কেলে শুনি?' খুড়িমা বললেন: 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে তুই?' আমি বললাম: 'এই তো এই বুড়োটার সঙ্গে।' খুড়িমা ঘুরে বললেন: 'কেন, কেন? কী বলছে ও?' আমি ওর কথাগুলো খুড়িমাকে জানালাম। খুড়িমা ওকে বললেন: 'এক পা তো শ্মশানে দিয়ে রেখেছ! এখনও মাথার ভেতর যত রাজ্যের বদ চিন্তা ঘুরঘুর করে? মুখটা তো একটা নর্দমা বানিয়ে রেখেছ! ভালো সুশ্রী মেয়ে দেখলেই বুঝি নোংরা কথাগুলো মুখ থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসে? জানো, তোমার মুখে এক্ষুনি এক লাথি কষাতে পারি আমি!' বুড়োটা প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পায় না।

শিব ঠাকুর দর্শন করে আমরা দুর্গা মন্দিরে গেলাম। সেখানে স্বামী ভাস্করানন্দ** থাকতেন। আমি খুড়োর সঙ্গে বেশ কয়েকবার তাঁকে দর্শন করেছি এবং প্রসাদ পেয়েছি। আজ তাঁকে আমি বিদায় জানাতে এসেছি। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন: 'মা, তুমি কি তোমার

*প্রথম বউয়ের কোনো ছেলে না-হওয়াতে শিবনাথ শাস্ত্রীকে (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর বাবা জোর করে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেন। ১৮৬৮-তে তাঁর কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হয়। ১৮৬৯-এ তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ও পরিবার নিয়ে ভারত আশ্রমে উঠে আসেন। কলকাতায় তিনি সাউথ সাবার্বান স্কুলে প্রধান শিক্ষক, পরে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত হয়েছিলেন। খ্যাতনামা ব্রাহ্মনেতাদের একজন শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন নারী-অধিকার রক্ষার প্রবক্তা, শক্তিশালী লেখক ও বহু লোকহিতকর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৭-এ কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভুমিকা নেন। ১৮৯২-এ তিনি ব্রাহ্ম কর্মী ও ভক্তদের আবাস সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ব্রাহ্মদের একটি ঘনিষ্ঠ আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী তৈরি করা, যাঁরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করবেন।

**প্রখ্যাত সাধক, স্বামী ভাস্করানন্দ ১৮৭০-এর প্রথম দিক থেকে বেনারসে বাস করতেন। তিনি কখনো মৌনব্রত অবলম্বন করেননি, মানুষজনের সঙ্গে দেখা করতেন, কথা বলতেন, তাদের নানা উপদেশ-পরামর্শ দিতেন।

সংসারে যাচ্ছ?' আমি বললাম: 'বাবা, কোথায় আমার সংসার?' স্বামী বললেন: 'হ্যাঁ, তোমার ঘর-সংসার সবই আছে; যেখানেই তুমি যাও না কেন, তোমার ঘর-সংসার হবে।' আমি বললাম: 'বাবা, কিন্তু আমি তো পড়াশোনা করতে যাচ্ছি।' তিনি জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ, মা, তুমি যেখানেই যাও, ঘর-সংসার তোমার হবে।' তিনি কী বলতে চাইছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তাই শুধু বললাম: 'যেমনটি আপনি আদেশ করেন।'

কিছুদিন বাদে খুড়ো আমাকে বললেন: 'বাছা, তুমি তো বেনারস ছেড়ে চলে যাচ্ছ, কিন্তু একটা জিনিস তোমাকে এখনও দেখানো হয়নি।' আমি বললাম: 'বেশ তো, চলো, আজই যাওয়া যাক, দেখে আসি।' খুড়ো রাজি হলেন। বিকেল তিনটেয় খুড়ো, খুড়িমা আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। বরুণা ঘাট পেরিয়ে কিছুটা দূরে আমরা একটা সুরঙ্গের ভেতর ঢুকলাম। ভেতরটা ঘন অন্ধকার, চোখ চলে না। খুড়ো সঙ্গে কয়েকটা মোমবাতি এনেছিলেন। তার একটা জ্বালিয়ে তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। কিছুটা দূর যাওয়ার পর তিনি জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন: 'নারায়ণ, নারায়ণ।' কোনো সাড়া নেই। তিনি ফের ডাকলেন: 'নারায়ণ?' এবার সাড়া মিলল, কিন্তু বাপরে! কী গলা, যেন বাজ ডাকছে: 'নারায়ণ আছে, আপনারা এগিয়ে আসুন।' আমরা এগোলাম। দেখতে পেলাম, একজন কঙ্কালসার মানুষ যোগাসনের ভঙ্গিমায় বসে আছেন। চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার, তার মধ্যে যতটুকু চোখ চলে। ধুনির আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ছাইয়ের পাশে কয়েকটা ফল, কিছু ফুল এখানে-সেখানে ছড়ানো। সাধুটি পুরোপুরি নগ্ন। জানি না কোথা থেকে সেখানে কিছুটা আলো-বাতাস আসছে। আমরা আভূমিলম্বিত হয়ে তাঁকে প্রণিপাত করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কেন এসেছি। আমরা বললাম, ধর্মাত্মাকেই দেখতে এসেছি। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন এই বলে, 'সদা আনন্দে থাকো' আর ধুনিভস্ম আশীর্বাদী দিলেন। আমরা জিগেস করলাম: 'বাবা, আপনি এখানে কতদিন আছেন?' তিনি বললেন: 'তা আশি বছর হয়ে গেল আমি এখানে বাস করছি।' আমরা জিগেস করলাম: 'বাইরে বেরোন না?' 'আগে বেরোতাম, কিন্তু গত আট বছর ধরে পা দুটো অসাড় হয়ে যাওয়ায় আর বেরোতে পারি না।' 'বাবা, কতদিন ধরে আপনি এই সন্ন্যাস জীবন যাপন করছেন?' তিনি বললেন: 'তা একশো বছর হয়ে যাবে। আগে আমি জনপদে খোলা জায়গায় বাস করতাম, কিন্তু মানুষজন সাধনা, উপাসনায় বড়ো ব্যাঘাত ঘটায়। সেজন্যে এই নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছি। একই আসনে কয়েক বছর ধরে উপবিষ্ট থাকার ফলে আমার পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, সেজন্যেই আর বেরোতে পারি না।' 'বাবা, দয়া করে আমাদের কি কিছু উপদেশ দেবেন?' 'হ্যাঁ, আমি যা জানি তা তোমাদের বলতে পারি। ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে আগে নিজেকে জানতে হয়। যিনি নিজেকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকেও জানেন।' 'বাবা, নিজেকে কীভাবে জানা যায় আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়ই বা কী?' 'যেমন সবাই মানে "আমি আছি" তেমনভাবেই ব্রহ্মর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই মানুষ প্রার্থনা করে, ধর্মাচরণ করে ও তিনি তাদের আশিস দেন। তার কৃপায় মানুষ আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়। সে আনন্দ চিরস্থায়ী, তার কোনো অন্ত নেই।' 'বাবা, আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?' 'বাংলার বর্ধমান জেলা থেকে। মহারাজ প্রতাপচাঁদ* আমার বন্ধু ছিলেন; তাঁর অধীনে আমি কাজও করতাম। রাজা ও আমি দু-জনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাপসের কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত গ্রহণ করলাম। পরে রাজবাড়ি থেকে লোকজন এসে রাজাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। আমি তখন থেকেই এই জীবন যাপন করছি। আমাদের দীক্ষাগুরু গুরুদেব তুলসীদাসের একজন শিষ্য।' আমরা জিগেস করলাম: 'তাঁর ধর্ম কী?' (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক অভিধানকার ও প্রাবন্ধিক।

*বর্ধমান-রাজের রাজা প্রতাপচাঁদ (১৭৯১-১৮২১) কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যান। প্রায় পনেরো বছর বাদে এক ব্যক্তি এসে নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলে দাবি করেন। বলেন, তিনি উত্তর ভারতে প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবার থেকে দাবি করা হয়, প্রতাপচাঁদের বাবা নিজের হাতে ছেলের শবদেহের সৎকার করেছিলেন। ১৮৩৯-এর মামলার শুনানির পর দোষী সাব্যস্ত হন জাল প্রতাপচাঁদ সাজার অভিযোগে, তাঁর অর্থদণ্ডও হয়। সঞ্জীবচন্দ্র চ্যাটার্জী (বঙ্কিমচন্দ্রর বড়ো ভাই) 'জাল প্রতাপ' নিয়ে একটি জনপ্রিয় উপন্যাস লেখেন। সেখানে তিনি দাবিদারকে প্রকৃত প্রতাপচাঁদ বলেই প্রতিপন্ন করেন। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু সাধক কমলাকান্ত ১৮০৯-এ বর্ধমান-রাজের সভাপণ্ডিত হয়ে এসেছিলেন। গল্পকথায় প্রচলিত, প্রতাপচাঁদ তাঁর কাছেই দীক্ষিত হয়েছিলেন।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?
কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে
সম্ভব
সরকার বলছে
অসম্ভব
আমরা বলছি
সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।
আপনি?
'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

কিবেরা ও অন্যান্য বস্তি, নাইরোবি, কেনিয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে শঙ্করকে মনে আছে তো? উগান্ডা রেলপথের চাকরি নিয়ে শঙ্কর আফ্রিকা পাড়ি দিয়েছিল ১৯০৯ সালে। কেনিয়া-উগান্ডা সংযুক্তির এই রেলপথ নির্মাণের সময়ে ১৮৯৯-তে গড়ে ওঠে নাইরোবি শহর। তখন ব্রিটিশরা সেখানে নানা দেশের অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের জন্য নিয়ে এসেছিল। রেলপথ নির্মাণপর্বের পর এঁদের, বিশেষত আফ্রিকান 'নেটিভ'দের, বসবাসের জন্য ঠেলে দেওয়া হয় শহরের বাইরে জঙ্গলের ধারে। এছাড়া 'কিংস আফ্রিকান রাইফেল্‌স'-এর যুদ্ধ-ফেরত সুদানি 'নুবিয়ান' সৈনিকদেরও বসত করতে পাঠানো হত ওই এলাকাতেই। সেখানে এঁরা যেসব পল্লি গড়ে তোলেন তারই নাম 'কিবেরা' ('নুবিয়ান' ভাষায় অর্থ 'জঙ্গল')। নুবিয়ানরা এখানকার আদি বাসিন্দা হলেও বর্তমানে তাঁরা কিবেরা জনসমষ্টির মাত্র ১০%। এছাড়া রয়েছেন পশ্চিমাঞ্চল থেকে পরে আসা 'লুয়ো' (প্রায় ৩৫%), 'লুইয়া' (প্রায় ৩০%), 'কাম্বা' (প্রায় ৯%), 'কিকুয়ু' (প্রায় ৭%) ইত্যাদি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়।

১৯৬৩-তে কেনিয়া স্বাধীন হওয়ার পর রাজধানী নাইরোবিতে শাসক-নেটিভ পৃথকীকরণ বন্ধ হয়। কিন্তু কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ অর্থাভাবের কারণে ক্রমশ কিবেরা ও অন্যান্য বস্তিতে আশ্রয় নিতে থাকেন। নাইরোবির কারখানাগুলিতে ৫০% শ্রমিকই আসেন 'কিবেরা' থেকে। তা সত্ত্বেও কিবেরার কর্মক্ষম বাসিন্দাদের প্রায় অর্ধেকরই নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই, যদিও প্রত্যেকেই যথেষ্ট কর্মোদ্যোগী। 'কিবেরা'য় যেকোনো দিন সকালে দেখা যায় দলে দলে ব্যস্ত লোকজন রাস্তায় প্রাতরাশ কিনে কাজের উদ্দেশ্যে হেঁটে চলেছেন অথবা কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পশরা নিয়ে পথের পাশেই বসে পড়েছেন। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পরও তাঁদের আয় সীমিত। নাইরোবির বস্তিবাসীদের দৈনিক গড় আয় ১০০-১৫০ কেনিয় শিলিং (১ কেনিয় শিলিং বা স্থানীয় ভাষায় 'বব' =ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৩ পয়সা)। সারা মাসে মাত্র ১০ হাজার শিলিং আয় থাকলেই এখানে সেই পরিবারকে মধ্যবিত্ত ধরা হয়ে থাকে।

প্রায় ১১০০ একর এলাকায় ১৩টি পল্লি জুড়ে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম বস্তি 'কিবেরা'। নাইরোবিতে 'কিবেরা' ছাড়া আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো বস্তি রয়েছে, যেমন 'মাথারে', 'কোরোগোচো' ইত্যাদি। নাইরোবির ৬০%-এরও বেশি মানুষ বস্তিবাসী, যদিও তাঁরা শহরের ১০%-এরও কম জায়গায় বাস করেন। কিবেরার জনঘনত্ব হেক্টর প্রতি ২৩০০ জন। বাস করেন প্রায় ১০ লক্ষ (সরকারি

কিবেরা বস্তি

মতে বৈধতার বিচারে প্রায় ২ লক্ষ) মানুষ, যে সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এখানে প্রতিঘরে থাকেন গড়ে ৮-১০ জন। ঘরগুলির আনুমানিক মাপ ১৩০-১৬০ বর্গফুট, দেওয়াল মাটি বা টিনের, জানালায় পাল্লা নেই, মাথায় বাতিল টিনের চালা, মেঝে মাটি, জঞ্জাল বা ভাঙা কংক্রিট দিয়ে তৈরি। মাসিক ঘরভাড়া মোটামুটি ৭০০-১৫০০ শিলিং। ঘরগুলিতে আলাদা রান্নাঘর, স্নানাগার বা শৌচালয় নেই। *দি ইকনমিস্ট* পত্রিকায় ২০১২-তে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, বেশিরভাগ কিবেরাবাসীর কাছেই ঘরে রান্না একরকম বিলাসিতা। কারণ একবার রান্না করতে কমপক্ষে কুড়ি শিলিং কাঠকয়লা লাগে (খনিজ কয়লা মেলে না, গাছ কেটে কাঠকয়লা করা হয়)। কিনতে হয় দুষ্প্রাপ্য জল ও অন্যান্য সামগ্রী, নষ্ট হয় কাজের সময়। তুলনায়, গুণমান যাই হোক, রাস্তার খাবার সস্তা।

কিবেরায় জলের মূল উৎস নাইরোবি নদীর জলাধার। এই জল অপরিষ্কার, তবু মানুষ বাধ্য হয়ে তা সংগ্রহ করে। সেনসাস ২০০৯-এর হিসাবে সমগ্র কেনিয়ার মাত্র ৩৮.৪% নগরবাসী পাইপের জল পায়। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় জলের পাইপ বসেছে কিন্তু কিবেরাবাসীদের কাছে তা অধরা। কারণ অবৈধ জল বিক্রেতারা পরিকল্পিতভাবে পাইপে ছিদ্র করে ২-৩ শিলিং-এর বিনিময়ে ২০ লিটারের জেরিক্যান ভরে দেয়। ফলে কলের জল সবসময় পাওয়া যায় না। আর পাইপে জলের চাপ কমে গেলে ছিদ্র দিয়ে খোলা নর্দমার ময়লা পাইপে চলে আসে। যদিও তখন ওই জলের দামই হয় ৫-৭ শিলিং। এই চিত্র অন্যান্য বস্তিতেও একই রকম (ইন্টিগ্রেটেড রিজিয়োনাল ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক)।

জলের অভাব হলে শৌচালয়গুলিও বেশির ভাগ বন্ধ থাকে। শোধিত জল ও শৌচালয়ের অপ্রতুলতার জন্য বস্তিবাসীদের জীবনে ডায়রিয়া, কলেরা ও টাইফয়েড নিত্য সঙ্গী। সরকার অধিকাংশ কিবেরাবাসীর বসবাসের বৈধতা স্বীকার করে না বলে জলের এই অবৈধ ব্যাবসা বন্ধে উদ্যোগী নয়। জলের জন্য বস্তিবাসীদের খরচ নাইরোবির সম্পন্ন বাসিন্দাদের তুলনায় দশগুণ বেশি। যে কারণে ক্ষোভের সঙ্গে হিউম্যানিটারিয়ান ফিউচার গ্রুপ তার প্রতিবেদনে লিখেছে 'আর সব মূল্যবান সামগ্রীর মতো শোধিত জল ও শৌচালয় এখানে লোভ, অসাধু আঁতাত, দুর্নীতি ও বঞ্চনার এক আকর্ষণীয় মৃগয়াক্ষেত্র'।

কিবেরাসহ অন্যান্য বস্তির শৌচালয়গুলি অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানাধীন। প্রায় ৫০ থেকে ৮০ ঘর পিছু একটি শৌচালয়। ঘরগুলি থেকে শৌচালয়ের ন্যূনতম দূরত্ব ৪০-৫০ মিটার। মাটিতে গর্ত করে এবং বাতিল টিন, ভাঙা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী কাঠামোর এই শৌচালয়গুলি একজনের একবার ব্যবহারের খরচ ৫-১০ শিলিং, যা সব মিলিয়ে সারা মাসে একটি পরিবারের খরচের ৫-৭%। শৌচালয়গুলি ময়লায় পূর্ণ হলে বা জলের অভাবে বন্ধ থাকলে চালু শৌচালয় ব্যবহারের খরচ আরও বাড়ে। অর্থাভাবে তাই সকলের সবসময়ে শৌচালয় যাওয়া সম্ভব হয় না। শিশুদের জন্য তো এই খরচ একেবারেই করা হয় না। বয়স্কদের রাতে বা অসময়ে বেগ এলে, পেটের গণ্ডগোলে এবং মহিলাদের পক্ষে ঋতুকালে বারংবার শৌচালয় ব্যবহার অসুবিধাজনক, খরচসাপেক্ষও। তাছাড়া রাতে শ্লীলতাহানিরও আশঙ্কা থাকে। এমন অবস্থায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে ঘরের কোণে টিনের বালতিতে পলিথিন ব্যাগ রেখে মলত্যাগ করে রাস্তায় নর্দমা বা জঞ্জালের মধ্যে ফেলা হয়। পর্যটকরা নাইরোবি বস্তিবাসীদের এই অভ্যাসকে পরিহাস করে 'উড়ন্ত শৌচালয়' আখ্যা দিয়েছেন।

নিয়মিত শৌচালয়, নর্দমা, জঞ্জাল বা রাস্তা পরিষ্কারের পুরব্যবস্থা এখানে অনুপস্থিত। বর্ষায় নদী উপচে বন্যা হলে সমস্যা বাড়ে। মালিকরা শৌচালয় পূর্ণ হলে তার স্থান পরিবর্তন করেন নতুবা মজুর দিয়ে তার ময়লা পরিষ্কার করান, যা অধিকাংশ সময় নদীর ধারেই ফেলে আসা হয়। মজুরদের মধ্যে প্রায়শ অপ্রাপ্তবয়স্করাও থাকে। শিশুরা রাস্তায় খেলার সময় নর্দমার ধার বা জঞ্জালের স্তূপে পা দেয় এবং পায়ে বিষ্ঠা লেগে রোগাক্রান্ত হয়। এইভাবে ক্রমাগত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। কিবেরাসহ নাইরোবির বস্তিগুলির বাসিন্দারা সকলে এই সার্বিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হন, যার চরম প্রভাব পড়ে শিশুস্বাস্থ্যে।

নাইরোবির বস্তিগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫১, শহরের অন্যত্র ৬২। *আফ্রিকান পপুলেশন অ্যান্ড হেল্‌থ রিসার্চ সেন্টার*-এর সমীক্ষায় (২০১২) দেখা গেছে কেনিয়ার শহরগুলিতে শিশুরোগের ৭২%-এর উৎস অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মল থেকে জীবাণু সংক্রমণ। নাইরোবির বস্তিশিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ৯০% এবং এই সংক্রমণের অন্যতম ফল ডায়রিয়া। বস্তিশিশুদের প্রতি তিন জনে একজন সবসময় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত থাকে, সমগ্র শহরে এই হার পাঁচে এক। এছাড়া আন্ত্রিক ও কৃমির কারণে প্রায় ২৫% বস্তিশিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এই সঙ্গে রয়েছে ম্যালেরিয়া, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ ও চর্মরোগ। ৪৮% পরিবারে শিশুরা এরকম কোনো-না-কোনো রোগে ভুগছে। কিবেরার জনসংখ্যার অর্ধেকেরই বয়স ১৫ বছরের নীচে এবং তার ৬০% অর্থাভাব ও অসুস্থতার কারণে স্কুল যেতে পারে না (*ইউনিসেফ* ২০১৪)।

'মাথারে' বস্তির একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, একজন বয়স্ক ব্যক্তির একবার ডায়রিয়ায় ডাক্তার-ওষুধ-পরিবহণ বাবদ প্রত্যক্ষ খরচ ৩০০ শিলিং, জল-জ্বালানি-শৌচালয় ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক খরচ ১৩০ শিলিং, তাঁর ও সেবাপ্রদানকারীর মোট উপার্জন হ্রাস ৭২০ শিলিং, এবং এইভাবে সব মিলিয়ে ক্ষতি ১১৫০ শিলিং, যা একটি পরিবারের মাসিক ব্যয় গড়ে ১১.৫%পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। (*করবার্ন ও করঞ্জা, জুন ২০১৪, হেল্‌থ প্রোমোশন ইন্টারন্যাশনাল, ভলুম ৩১, ইস্যু ১, অক্সফোর্ড অ্যাকাডেমিক*)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের '*ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম*' (২০১২)-এর তথ্যানুযায়ী কেনিয়ায় অপ্রতুল শৌচালয়ের কারণে বছরে ৫১০ লক্ষ ডলার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয় এবং ২৭ লক্ষ ডলার উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়।

কেবল শিশুস্বাস্থ্য নয়, নাইরোবির বস্তিগুলিতে মায়েদের স্বাস্থ্যও অতি সংকটাপন্ন। '*কেনিয়ান ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেল্‌থ সার্ভে*'(২০১০) থেকে জানা যায় নাইরোবি শহরে যখন মেয়েদের মধ্যে ডায়রিয়া আক্রান্তের হার ১৩%-এরও কম, তখন বস্তি এলাকায় এই হার ২৬%। শৌচালয়ের অব্যবস্থার কারণে বস্তিগুলির ৮০% মহিলা কোষ্ঠকাঠিন্য ও মূত্রনালীর সংক্রমণে ভোগেন। কিন্তু কেবল সংক্রমণ নয়, কিবেরাসহ অন্যান্য বস্তিবাসীদের, বিশেষত মহিলাদের, সবচেয়ে বড়ো বিপদ হল এইচ.আই.ভি./এইড্‌স। নাইরোবি শহরে ৫% মানুষ এইচ.আই.ভি. রোগী হলেও বস্তিগুলিতে এই হার ১২%, কিবেরাতে ২০%। আবার বস্তির মহিলাদের মধ্যে এইচ.আই.ভি.-র হার পুরুষদের তুলনায় ৩৮% বেশি, ১৫-২৪ বছর বয়সি মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৪-৫ গুণ বেশি। নারীস্বাস্থ্যের এই ব্যাপক অবনতির অন্যতম কারণগুলি হল:

১. চরম দারিদ্র্য। অভাবের সঙ্গে লড়তে প্রায় সব মহিলাই নামমাত্র উপার্জনেও যেকোনো কাজের চেষ্টা করেন। যেমন উইনি, কিবেরার পথে চুনো মাছ ভাজা বিক্রি করে মাসে মাত্র হাজার শিলিং আয় করেন (সাক্ষাৎকার—*ইন্টার প্রেস সার্ভিস*, ১৯. ৮. ২০১১)। কিন্তু এই উপার্জনে দু-বেলা খাওয়া ও শৌচালয়ে যাওয়ার পয়সা জোটানো অসম্ভব। স্থায়ী ঠিকানা বা সঞ্চয় না থাকায় এইসব পথ ব্যবসায়ীরা ঋণ বা আর্থিক সহায়তাও পান না। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের অভাবে মহিলাদের অধিকাংশই অদক্ষ কাজে নিযুক্ত হন। নিজের ও সন্তানের মুখের গ্রাস জোগাড় করতে কেউ কেউ কাপড় কাচা, শৌচালয় পরিষ্কার, অবৈধ জল বিক্রয়ে সাহায্য, এমনকী দেহ-ব্যবসায় পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে পড়েন।

২.স্বাস্থ্যে অবহেলা। 'মাথারে' বস্তির উল্লেখিত সমীক্ষায় মহিলাদের ৪৬% কাশি ও শ্বাসকষ্ট, ৩০% ডায়রিয়া, ২৩% ম্যালেরিয়া, ২২% জ্বর, ১৭% টাইফয়েড জনিত কারণে অসুস্থ থাকেন। বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ায় ৩৩% মহিলা ডায়াবেটিস-এর শিকার। অর্থাভাবে প্রায়-উপবাসের ফলে অপুষ্টি ও অ্যানিমিয়াতেও ভুগছেন অনেকেই। বস্তিগুলিতে নেই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রজনন স্বাস্থ্যেও রয়েছে চরম অবহেলা। মাত্র ৪৩.৮% প্রসূতি স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান। ফলে প্রসূতিমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫৯ ('*হু*' ২০১২) এবং ৬% নবজাতক জন্মকালেই মারা যায়। কিবেরায় ১৬-২৫ বছর বয়সি মেয়েদের ৫০% সবসময়ে গর্ভবতী থাকেন যার অধিকাংশই অবাঞ্ছিত এবং হাতুড়ের মাধ্যমে বিপজ্জনকভাবে গর্ভমোচনের চেষ্টা করেন (*কিবেরা.অর্গ. ইউকে*)। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এখানে অনুপস্থিত।

৩.শিক্ষাহীনতা। 'কিবেরা'র যে ৪০% শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। কিবেরাতে সরকারি স্কুল নেই, বেসরকারিই ভরসা। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সরকারি স্কুলও অবৈতনিক নয় এবং সেখানে একজনের সারা বছর সব মিলিয়ে পড়ার খরচ ন্যূনতম প্রায় ৫০ হাজার শিলিং, যা মেটানো অনেকের পক্ষেই অসম্ভব (*মাইকেল চাইল্ড্রেস,* জানু. ২০১৬, 'দি *স্কুল ফান্ড.অর্গ*')। কোনো পরিবার চেষ্টা করে একজনকে পড়াতে পারলেও সে কখনোই মেয়ে নয়। উপরন্তু অধিকাংশ স্কুলে মেয়েদের শৌচাগার নেই। এই অসুবিধায় কেনিয়ার ছাত্রীরা ঋতুকালে প্রতিমাসে প্রায় ৩৫ লক্ষ দিন স্কুল কামাই করে এবং প্রায়শই স্কুল ছেড়ে দেয় (*করবার্ন ও হিল্ডেব্র্যান্ড,* ২০১৫) ।

৪. পৌর-প্রশাসনিক অব্যবস্থা। নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, শৌচালয় চালু রাখা, নর্দমা ও আবর্জনা সাফাই, প্রাথমিক চিকিৎসা ও বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদান, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্মতিদান, পর্যাপ্ত আলোসহ পাকা পথ ও পুলিশ, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পরিষেবা বস্তির অভ্যন্তরে পৌঁছায় না। ফলে প্রতিটি পরিষেবাই বস্তিবাসীদের কিনতে হয়। সঙ্গী থাকে দুর্নীতি, বঞ্চনা ও সমাজবিরোধীদের উৎপাত। এমনকী রাতে দোকান বা পল্লি পাহারা দিতেও রাখতে হয় মাসাই রক্ষী।

৫. হিংসাত্মক পরিস্থিতি। যথা: গোষ্ঠীগত তথা দলীয় আধিপত্য রাখতে সংঘর্ষ, ঘরমালিক ও ভাড়াটের বিরোধ, কাজ ও মজুরি নিয়ে বিবাদ, গার্হস্থ্য কলহ ও বিচ্ছেদ, সঙ্গে স্থানীয় মদ (৫০% অ্যালকোহলযুক্ত) 'চঙ্গা'-র প্রভাব ও সুস্থ বিনোদনের অভাব। আর এইসবের পরিণতি নানা মাপের অপরাধ ও মহিলাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ। 'মাথারে' বস্তির উল্লেখিত সমীক্ষায় ৬৮% মহিলা জানিয়েছেন তাঁদের অসুস্থতার একটি কারণ নিগ্রহ। অপর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ কিবেরার ৩৬% মহিলা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য হন যার ফলে এইচ.আই.ভি.-র আশঙ্কা বাড়ে।

'*বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা* (*হু*)'-র (২০১০) বিচারে এইচ.আই.ভি. রোগীদের ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২-৬ গুণ বেড়ে যায়। তাই এই রোগীদের নিরাপদ শৌচব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে দৈনিক ২০-৮০ লিটার বাড়তি জলের জোগান থাকা উচিত, বস্তিগুলিতে যা পাওয়া অসম্ভব। অথচ উপর্যুপরি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে এইচ. আই.ভি. রোগীদের শরীরে খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধের বিশোষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং রোগী ক্রমে এইড্স আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। যে কারণে কিবেরাতে মানুষের গড় আয়ু পঁয়ত্রিশ বছর, সমগ্র কেনিয়ায় যা পঞ্চাশ (*ইউনাইটেড নেশনস্,* ২০১০)। শুধু কিবেরাতেই বাবা-মা-র এইড্স-এর কারণে কমপক্ষে ৫০ হাজার শিশু অনাথ, সমগ্র কেনিয়ায় এই সংখ্যা ১১ লক্ষ (*ইউনিসেফ* ২০১২)। প্রতি বছর এইড্স-এ মারাও যায় ৭% শিশু। অনাথ শিশুদের দায়িত্ব প্রধানত নিয়ে থাকেন প্রতিবেশী মায়েরা, যাঁদের অধিকাংশই নিজ সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতেই রীতিমতো জেরবার।

জনৈক নিঃসহায় মায়ের কথায়: "আমি কোনো কাজ পাই না, বাচ্চা রাখারও কোনো জায়গা নেই। জ্বালানি কেনার পয়সা নেই, রাস্তার দোকান থেকে ধারে খাবার আনি। ধার মেটাতে না পারলে তাও বন্ধ। ওকে খাওয়াতে গিয়ে আমি প্রায়ই না খেয়ে থাকি। দু-দিন হল বাচ্চাটা খিদেয় ছটফট করছে। তাই এই লোকটা যখন দু-শো বব্ নিয়ে এল, আমি না করতে পারলাম না। কন্ডোম নিতে বললাম, রাজি হল না। আমার আর উপায় ছিল না। জানি আমি এইচ.আই.ভি. পজিটিভ, ক্লিনিকে গেলে ওষুধ পাব, কিন্তু খাবার ছাড়া ওষুধ নেব কীভাবে। তাই খাবার জোটাতে কখনো কখনো ওষুধও বেচে দিই। বেঁচে থাকার জন্যে এছাড়া আর কী করতে পারি" (সাক্ষাৎকার: *করবার্ন ও করঞ্জা, প্রাগুক্ত*)। আমরা জানি না শিশুটিকে অনাথ না করে এই মা এভাবে আর কতদিন বাঁচবেন। এখন প্রশ্ন, এমন দৈন্য-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য দেশের সরকার ও সমাজ কী করছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কেনিয়া সরকার ২০১০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে 'নাইরোবি সিটি কাউন্সিল'-কে ক্ষমতাহীন করে রাখে, অথচ নাগরিক পরিষেবার সব দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। সরকার কিবেরাতে তার বাসিন্দাদের স্বত্ব অস্বীকার করে ও বস্তি অপসারণে উদ্যোগ নেয়। বস্তি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে প্রশাসনিক কর্তারা বস্তির জমিতে অবৈধ ঘর তুলে ভাড়া দেওয়া, অবৈধ জল বিক্রি ইত্যাদি থেকে বেআইনি অর্থ সংগ্রহ চালিয়ে যায়। যেমন, একটি অবৈধ ঘর তোলার অলিখিত অনুমতির নজরানা ছিল ৫০০০ শিলিং (*দি ইকনমিস্ট,* ৩ মে ২০০৭)। ইতিমধ্যে শতাব্দীর শুরুতে '*ইউনাইটেড নেশন্স*' তার '*মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল*' ঘোষণা করে (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র জুন-জুলাই ২০১৭-র ৫৫ পাতা দ্রষ্টব্য)। ২০০৩-এ 'ইউ এন-হ্যাবিট্যাট'-এর সহযোগিতায় তিনটি নগরে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থে ৬.৮ বিলিয়ন ডলারের 'কেনিয়া স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম' চালু হয়। আর কিবেরাসহ অন্যান্য বস্তিতে পরিষেবা প্রদান ও পরিকাঠামো নির্মাণে হাত বাড়ায় 'বিভিন্ন অসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা 'এন.জি.ও'।

এই সংস্থাগুলি আধুনিক শৌচালয়সহ বায়োগ্যাস তৈরি, প্রথাবহির্ভূত স্কুল প্রতিষ্ঠা, রাস্তা বাড়ানো, ইত্যাদি নানারকম প্রকল্প শুরু করে। নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করে 'কেয়ার ফর কেনিয়া'। যদিও চাহিদার তুলনায় এইসব প্রয়াস খুবই সীমিত। এরই মধ্যে সরকার নিয়মরক্ষায় প্রকাশ করে '*ন্যাশনাল হেল্‌থ সেক্টর স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান*' এবং ২০০৫-এ চালু করে '*কম্যুনিটি হেল্‌থ ভলান্টিয়ার*' ব্যবস্থা। কিন্তু পরিকাঠামো, প্রেরণা বা পুরস্কার কিছুই না থাকায় দায়িত্ব থেকে অধিকাংশ 'ভলান্টিয়ার' সরে যেতে থাকেন এবং হাতুড়েদের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ে। এই অবস্থায় ভলান্টিয়ারদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে 'আফ্রিকান মেডিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন' ইত্যাদি সংগঠন। আর এইভাবে অসরকারি সংগঠনগুলির ওপরই সরকার পরিষেবার দায় ছেড়ে রাখে। ইতিমধ্যে সরকার কিবেরার মূল্যবান ৩০০ একর জমি উদ্ধার ও নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। ২০০৯ সালে ১.২ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের সময়সীমা ছিল ৯ বছর, যদিও তা এখনও শেষ হয়নি। প্রথম দিন (১৬. ০৯. ২০০৯) পুলিশ বাহিনীর সামনে ১৫০০ বাসিন্দাকে সাময়িক আস্তানায় সরানো হয় এবং ৩০০ ফ্ল্যাট বরাদ্দ হয়। ভাড়া মাসে গড়ে হাজার শিলিং, ধারে কিনলে ১ম কিস্তি ১.৩৫ লক্ষ শিলিং ধার্য হয়।

বস্তি উচ্ছেদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা ওঠে, কিন্তু হাইকোর্ট রায় দেয় যাঁরা স্বেচ্ছায় বস্তিবাসা ছেড়ে এসেছেন তাঁদের পুরানো বাসা ভেঙে দিতে বাধা নেই। যদিও অপসারিত বস্তিবাসীদের অনেকেই নতুন ফ্ল্যাটে যেতে পারেননি। যেমন, প্রৌঢ়া মামা সাবেটি ওমাব্‌সো, যিনি 'ইউ.এন.ও'-র বসত বিষয়ক ইথিওপিয়া সম্মেলনে কিবেরার প্রতিনিধি ছিলেন, ২০১৫-তেও তিনি কিস্তির টাকা জোগাড় করতে পারেননি। সাইমন, পেশায় ছুতার, পুরানো বাসা ছেড়ে কাজের বাজার হারিয়ে ভাড়া দিতে অসমর্থ রয়েছেন (*ইন্টারন্যাশনাল অ্যালার্ট*, ২০১৩)। অল্প কয়েকজন, যাঁরা নতুন ফ্ল্যাটের দখল নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার ভাড়া দিয়ে অন্যত্র চলে যান। এদিকে নিম্নমানে তৈরি ফ্ল্যাটগুলি ছয় বছরেই জরাজীর্ণ। পয়োপ্রণালী ও জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে বাসিন্দাদের অবস্থা দুর্বিষহ। বিপরীতে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্তা ও অনুপস্থিত ঘরমালিকরা অবৈধ রোজগার হারানোর ভয়ে বস্তির অভ্যন্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন।

এই পরিস্থিতিতে দু-টি উদ্যোগ শুরু হয়। একদিকে, 'ইউ এন-হ্যাবিট্যাট'-এর 'পার্টিসিপেটরি স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম' সরকারকে বস্তির বাস্তবতা মেনে নগরের দরিদ্রতম অধিবাসীদের সম্পর্কে সংবেদনশীল থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আহ্বান করে। সেই সঙ্গে যথাযথ বাসস্থানকে 'মানবাধিকার' উল্লেখ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাথে কর্পোরেটগুলিকেও যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর কিবেরার পূর্ব সোয়েটো পল্লির প্রকৃত বাসিন্দা, যাঁদের সরে যেতে হবে, তাঁদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় 'সোয়েটো ইস্ট হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি'। দৈনিক ২০ শিলিং চাঁদায় সদস্যরা পান 'আইডেন্টিটি কার্ড', যার বিনিময়ে তাঁরা পাবেন নতুন ফ্ল্যাটে ঝামেলাহীন প্রবেশের অগ্রাধিকার। তাছাড়া সদস্যদের জন্য তৈরি হয় 'রিসোর্স সেন্টার', যেখানে আছে বড়ো হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে 'ভিডিও কনফারেন্সিং'-এর সুবিধাসহ ক্লিনিক ও ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার কেন্দ্র। সেন্টারের ডাক্তার জন ওকিরি জানিয়েছেন, এখন বেশি রোগী আসছেন ডায়রিয়া, চর্মরোগ, শ্বাসনালী ও মূত্রনালীর সংক্রমণ নিয়ে, নিজস্ব বাথরুমসহ পরিচ্ছন্ন বাসা হলে যা আর থাকবে না (সূত্র:'*সিটিস্কোপ*', ৭ আগস্ট ২০১৫)। দ্বিতীয় উদ্যোগে, স্থানীয় পল্লিগুলির নিজস্ব ৬০০টি সংগঠন ও কিছু এন.জি.ও কিবেরার ভিতরেই বস্তিবাসীদের জীবনের মান উন্নত করতে সচেষ্ট হয় এবং 'হিউম্যান নীড্‌স প্রজেক্ট গ্রুপ' গড়ে তোলে। এঁরা কিবেরায় এমন 'টাউন সেন্টার' গড়ার কাজ শুরু করেন যেখানে পরিবেশ-বান্ধব শৌচালয়, নিরাপদ পানীয় জল, গরম জল সহ স্নানাগার, কাপড় কাচার মেশিন, ইত্যাদি থাকবে। সেইসঙ্গে কাজে দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ এবং অল্পমাত্রার ঋণের ব্যবস্থাও থাকবে। সেন্টার চলবে স্বনির্ভরতায়, ব্যবহারকারীদের থেকে খরচটুকু নিয়ে (সূত্র: '*ডি. ডব্লিউ/টপ স্টোরিজ/আফ্রিকা*', ১৩ জুলাই ২০১৫)।

দুর্নীতি, বঞ্চনা ও সংঘাত এড়িয়ে এইসব প্রচেষ্টাগুলি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে সফল হবে তখনই, যখন ব্যবহারকারী বাসিন্দারা নিজেরা সরাসরি পরিকল্পনায় যুক্ত থাকবেন এবং যৌথভাবে প্রকল্পের সক্রিয় তদারকি করতে পারবেন। *শ্যাডো সিটিজ: এ বিলিয়ন স্কোয়াটার্স, এ নিউ আর্বান ওয়ার্ল্ড* (২০০৫) গ্রন্থে 'রবার্ট ন্যুওয়ার্থ' বলেছেন, 'কিবেরা', 'ধারাভি', এগুলি সবই আগামীদিনের নগরের আদিরূপ; কেননা গ্রাম থেকে চলে আসা বস্তির বাসিন্দারা নগরের বহুতল আবাসন, সারিবদ্ধ দোকান, ব্যাঙ্ক, পুর-প্রশাসন, সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয়ভাবে এক জটিল অর্থনীতি, এক নতুন ধরনের সামাজিক কাঠামো উদ্ভাবন করছেন, যা আগামীদিনের সম্পদ ও সম্প্রদায়ের স্বরূপ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দেবে। তাই নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে বস্তিবাসীদের মর্যাদা আজ দিতেই হবে। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ।

ভ্রম সংশোধন

স্বাস্থ্যের বৃত্তে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৮)-র "**দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা**" লেখাটিতে ৪৯ পাতার ১ম কলামের শেষ প্যারার ৫ম লাইনে আছে '...মধ্য ভারতের নানা দেশে।' হবে '...মধ্য এশিয়ার নানা দেশে।

স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৮

ডা. অপূর্ব

পয়লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাষ্ট্রীয় বাজেট যখন পেশ হল আমরা ভাবলুম 'অচ্ছে দিন' এল বুঝি। নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষাও যে একটা সরকারি দায়িত্ব সেই টনকটা বুঝি সরকারের মাথায় আচম্বিতে একশো ওয়াটের বাল্বের মতন দপ করে জ্বলে উঠল। সুস্বাস্থ্য কিনতে জনগণ যাতে ফতুর না হয়ে যায় তার জন্যে অনেক অনেক আশ্বাস শোনা গেল। নতুন প্রকল্পের নাম হল National Health Protection Scheme (NHPS)। অর্থমন্ত্রী দেশের দশ কোটি গরিব পরিবারের জন্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা ঘোষণা করলেন। শ্যামচাচার দেশের ওবামাকেয়ারের অনুপ্রেরণায় দেশভক্তেরা এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের নামও দিয়ে ফেলল 'মোদিকেয়ার'। যুগান্তকারী নিঃসন্দেহে। অন্তত বিমা কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু যাঁদের জন্যে এত সুবিধার কথা ঘোষণা করা হল তাঁরা কতটা উপকৃত হলেন? বিশ্লেষকের চোখে না দেখে শুধু যদি ওপর ওপর দেখা যায়, সরকার যে জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেওয়া কর্তব্য বলে মনে করছে এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে চাইলে এত বেয়াড়া রকমের প্রশ্ন উঠে আসে যে সেগুলোর সেরকম সদুত্তর পাওয়া যায় না। ভারতের মানুষের দারিদ্র্যের জন্য অন্যতম দায়ী গাঁটের কড়ি ফেলে স্বাস্থ্য কেনার বর্তমান ব্যবস্থাটি। অনেকবার অনেকরকমভাবেই এই কথাটা উঠে এসেছে যে সরকার যদি জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব না নেয় তাহলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের পক্ষে আজ পর্যন্ত সে কাজটা করা হয়ে ওঠেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই বছরের ট্যাগলাইন 'Universal Health Coverage' বা সবার জন্যে স্বাস্থ্য-পরিষেবার ব্যবস্থা করা। ভারতও এর স্বাক্ষরকারী দেশ। কিন্তু স্বাক্ষরে আর কী আসে যায়! স্বাক্ষর, চুক্তি কম তো হল না, তাতে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি আর কতটা হয়েছে! এবারের বাজেট একটু তলিয়ে দেখা যাক সবার জন্যে স্বাস্থ্যের দিকে হাঁটার কোনো লক্ষণ সরকারের এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে কিনা।

যতটা ঢাকঢোল পিটিয়ে নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হল, বরাদ্দ কিন্তু সেই হিসেবে যেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, বেড়েছে গতবছরের বরাদ্দের ২.৫%। বলা হয়েছে ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। হিসেবে দাঁড়ায় প্রতিটির জন্যে ৮০০০০ টাকা করে! টাকা বাড়লেই ব্যবস্থা ভালো হবে এমনটা নয়, কিন্তু এই টাকায় একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খুব কিছু হাল ফিরবে না, নতুন তৈরিও সম্ভব নয় এই টাকায়। দেশে এখন সাবসেন্টার আছে ১৫৬২৩১টি। তার মাত্র ১১% মানের দিক দিয়ে ঠিকঠাক। বাকি বেশির ভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথেষ্ট ওষুধ বা কর্মী নেই। ২০% সাবসেন্টারে জলের ব্যবস্থা নেই, ২৩% শতাংশে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। এই সমস্ত তথ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকেরই দেওয়া।

প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল অবস্থা নিয়ে কোনো যৌক্তিক সমাধানের উল্লেখ নেই। দীর্ঘস্থায়ী অ-সংক্রামক রোগ (Chronic Non-Communicable Diseases) যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ে কোনো কথা নেই। অথচ দেশের এক বিরাট অংশ মানুষ এইসমস্ত রোগে আক্রান্ত এবং এই সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই রোগগুলিই মানুষের মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির স্থায়ী নিরাময় হয় না বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার পড়ে না। আজীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হয়, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ছাড়া পরীক্ষা করাতে হয়, যার মোট খরচ ধরতে গেলে অনেক হয়ে যায়। গরিব মানুষের পক্ষে এই রোগগুলি চিকিৎসা করিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। অথচ স্বাস্থ্য-বাজেটে প্রাধান্য পেল যেসব রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নিতে হয় সেই সমস্ত রোগের চিকিৎসা, অপারেশন ও পরীক্ষানিরীক্ষা। এগুলোর গুরুত্ব নেই বলা হচ্ছে না। কিন্তু এটা হল, চোখে পড়ে যে সমস্যা কেবল তার দিকেই নজর দেওয়া। এই পরিকল্পনায় জোর পড়ে একবার ভর্তি হয়ে বা সম্পূর্ণ সারানো যায় এমন অসুখের ওপর, আর অসুখ হয়ে যাওয়ার পর তার তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলির চিকিৎসার ওপর—ইংরাজিতে বললে কিউরেটিভ চিকিৎসা (curative treatment)-র ওপর। কিন্তু রোগ ঠেকানো বা প্রিভেনশন (preventive measures), বা দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা অনেক বেশি কঠিন। সরকার এই কঠিন কাজটা এড়িয়ে গিয়ে সাময়িক কিছু হাতে গরম সমাধান দিচ্ছে কিনা, সেটা দেখা দরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মডেল থেকে এটা পরিষ্কার যে, যেসব দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিমাব্যবস্থার প্রাধান্য বেশি সেই দেশে সার্বিক স্বাস্থ্যের মান আশানুরূপ নয়। আমেরিকাও তার মধ্যে অন্যতম। চিকিৎসার মান উন্নত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনে ব্যয়বহুল চিকিৎসা-সরঞ্জাম ব্যবহার হতে বাধ্য বিমাব্যবস্থার দেশগুলিতে, রোগীর নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে এরকম খরচের পরিমাণও কমানো সম্ভব নয় বিমাব্যবস্থায়। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (সংক্ষেপে RSBY) বা জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা (National Health Protection Scheme, সংক্ষেপে NHPS) কোনোটিই কিন্তু আউটডোরের রোগীদের সুবিধা দেয় না। অথচ তথ্য বলছে, পকেট থেকে যে চিকিৎসা-খরচ একজন রোগী করেন, তার শতকরা ৬৩ ভাগ করতে হয় আউটডোর চিকিৎসার জন্য। মানে রোগীর মোট নিজস্ব চিকিৎসা খরচের শতকরা মাত্র ৩৭ ভাগ টাকা বিমা ব্যবস্থা দিলেও দিতে পারে। নতুন বাজেটের স্বাস্থ্যবিমা মডেলও কি সেইরকমই হবে?

দ্বিতীয় খটকাটা যেখানে লাগছে সেটা হচ্ছে যে সরকার সরাসরি সেবাপ্রদানকারীর (service provider) দায়িত্ব না নিয়ে বরং বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে চাইছে। স্বাস্থ্যবিমা জিনিসটা আমাদের কাছে খুব নতুন এমনটা নয়। RSBY বা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কথা আমরা জানি। প্রায় ৩৩ কোটি মানুষ RSBY আর বিভিন্ন রাজ্য সরকারি বিমা যোজনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে নিজের পকেট থেকে যে খরচ দিতে হয় (যাকে Out of pocket Expenditure বলে) তার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey) অফিসের তথ্য তো অন্তত তাই বলছে.।

আগে যেখানে ৩% শিক্ষা সেস দিতে হত, এখন সেটা বাড়িয়ে ৪% করা হল যা নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস হিসাবে। এতে আয় বাড়বে ১১০০০ কোটি টাকা, যার ১০% এর কাছাকাছি মাত্র স্বাস্থ্যখাতে দেওয়া হবে।

তার সঙ্গে আয়কর দেন যারা তাদের আয়কর ছাড়ের জন্য হেলথ ইন্সুরেন্স প্রিমিয়ামের ন্যূনতম পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০০০০ টাকা করে দিয়েছে। অর্থাৎ কিনা বেশি ছাড় পেতে গেলে মানুষকে আরও বেশি বেশি করে ইন্সুরেন্স কিনতে হবে। এত কিছু দেখে শুনে কারও মনে প্রশ্ন আসতেই পারে—সরকার কার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তিত? আমার না বিমা কোম্পানির!

ভারতে স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলির মোট ব্যাবসা এখন ৩০,৩৯২ কোটিরও বেশি! আর এই ব্যাবসার বৃদ্ধির হার এখন প্রতি বছরে ২৫%! বিমা কোম্পানিগুলির এই স্বাস্থ্যোন্নতির পেছনে কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও তার হাজার রকম স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভূমিকা অসামান্য। বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এই বিমাব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, অপারেশন যেমন করছে, সেরকম সরকারি হাসপাতালে ভয়ানক দেরি হবার কারণে হয়রানি ও অব্যবস্থার ভয়ে রোগীরা এই সমস্ত নার্সিংহোমের সহজ শিকার হচ্ছে। এঁদের একটা বড়ো অংশ গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র মানুষ। শহরের অলিতে-গলিতে নিয়ম না মেনে গজিয়ে উঠছে নার্সিংহোম, পলিক্লিনিক। উদাহরণ হিসাবে ছত্তিশগড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওখানে রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে RSBY-এর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বিমা ব্যবস্থা চালু করে। কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে শহরের আনাচে-কানাচে অসংখ্য নার্সিংহোম গজিয়ে ওঠে, একই সঙ্গে দেখা গেল গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি, বরং দালালের মাধ্যমে গ্রাম থেকে লোকেরা এই নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা করাতে আসছেন আর বিমার আওতার বাইরেও অজস্র অপ্রয়োজনীয় খরচের মুখে পড়ছেন।

গত কয়েক বছরে RSBY ও অন্যান্য সমস্ত বেসরকারি ও রাজ্যসরকারি বিমা ব্যবস্থার আওতায় এসেছে প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ, অর্থাৎ দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। এই সংখ্যাটা বাড়বে এই বাজেটের পর। আরও দ্রুতগতিতে। এক দিকে সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ও আরেকদিকে 'নীতি আয়োগ' পুষ্টি জোগাবে এই বিমা ব্যবস্থাতে। নীতি আয়োগ প্রথম থেকেই অন্য খাত থেকে স্বাস্থ্যখাতে টাকা নিয়ে আসার পরিবর্তে স্বাস্থ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের পক্ষে জোর সওয়াল করে এসেছে।

স্বাস্থ্যবিমা ছাড়া কি আর কোনো উপায় ছিল না দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবান করে তোলার?

অবশ্যই ছিল। আমাদের হাতের কাছেই ছিল ইএসআই। স্বাস্থ্যবিমা, RSBY নিয়ে মাতামাতির মাঝে বেশ সুপরিকল্পিতভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ইএসআই-এর কথা। হাতের কাছে একটা সরকারি বিমাব্যবস্থার মডেল থাকতে, সেটার কথা সুপরিকল্পিত নীরবতায় ভুলিয়ে দিয়ে, বেসরকারি বিমাব্যবস্থাকে জায়গা করে দেওয়ার কোনো মানে ছিল না। বেতনের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে এর আওতায় চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া যেত। এর সঙ্গে অসংগঠিত শ্রমজীবীদের ইএসআই-এর আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া যেত। ইএসআই ছিল সারা দেশে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃতীয় স্তরের হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ সমস্ত কিছু ছিল। এই পরিকাঠামোটাকে কাজে না লাগিয়ে অবহেলায় নষ্ট করা হল গত দশ বছরে।

যে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সকলের জন্যে একই রকম সুবিধা থাকে না, সেখানে কেবলমাত্র গরিবদের জন্যে নেওয়া কোনো প্রকল্প শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় না, অবহেলায়, দুর্নীতিতে চাপা পড়ে যায়। সকলের জন্যে

ব্যবস্থা থাকবে একটাই, আর সকলেই প্রয়োজনমতো সেই ব্যবস্থার সুযোগ নেবে, এটাই কার্যকর ব্যবস্থা। এমনটা না হলে যেটা হয় যে,

রোগ ঠেকানো বা প্রিভেনশন (preventive measures), বা দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা অনেক বেশি কঠিন। সরকার এই কঠিন কাজটা এড়িয়ে গিয়ে সাময়িক কিছু হাতে গরম সমাধান দিচ্ছে কিনা, সেটা দেখা দরকার।

যার দরকার সে পায় না, আর কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পায়। ব্রিটেনের মতো সর্বজনীন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকলে সাধারণ মানুষও বিমার প্রিমিয়াম না দিয়ে স্বাস্থ্যের জন্যে কিছু বাড়তি ট্যাক্স দিতে কুণ্ঠিত হতেন না, সেই টাকায় সকলের জন্যে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা যেত। শুধু হাসপাতালে ভর্তি বা অপারেশন জাতীয় সুবিধা ছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধ সরবরাহ, রোগ যাতে না হয় তার জন্যে

কমিউনিটি-স্তরে (Community) প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য (Preventive Health) এখনকার মতো নাম-কা-ওয়াস্তে না হয়ে ভালো হতে পারত। তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার তুলনায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয়স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আরও বেশি কার্যকরী করা যেত। হাসপাতালগুলিতে যাতে সবসময় ডাক্তার নার্স থাকে, সাধারণ অসুখের চিকিৎসা, আপৎকালীন চিকিৎসার অবস্থার উন্নতি যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা করা যেত। অযৌক্তিক চিকিৎসা কমাতে প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি তৈরি করা যেত।

চিকিৎসার খরচের জন্যে ভারতে প্রতিবছর ৭% মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে যান। অনেক সমীক্ষায় এটা বারবার উঠে এসেছে। এমনকী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে রোগীর নিজের পকেট থেকে দেওয়া খরচের পরিমাণকে ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করেছে এই বছরেই। পূর্বতন RSBY বা এখনকার NHPS কোনোটিই সবার জন্যে স্বাস্থ্যের ধারে-কাছে দিয়েও যায় না। NHPS দেশের ৪০ শতাংশ মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নেওয়া যায় এমন চিকিৎসার খরচ দেবে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়, এটুকুই বলা যায়, তাও যদি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়। প্রচুর প্রচুর সমীক্ষা, সরকারি কমিটির রিপোর্ট বলছে স্বাস্থ্যখাতে খরচ ২.৫% থেকে ৩% এর মধ্যে আনতে পারলেই সমস্ত মানুষকে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত ওষুধ দেওয়া সম্ভব। সেখানে আমরা চলছি ১% থেকে ১.২%র কাছাকাছি বরাদ্দ নিয়ে। বিশ্বে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর হারে আমরা প্রথম স্থানে।

বাজারি গণমাধ্যমগুলি একদিক দিয়ে হয়তো ঠিকই বলছে, আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সত্যিই যুগান্তকারী, বিস্ময়কর, যেখানে সরকার আসে সরকার যায়, স্বাস্থ্যের জন্য অনেক গালভারী পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু মানুষের দিন বদলায় না।

তথ্যসূত্র:

১. https://thewire.in/economy/poor-will-not-true-beneficiaries-worlds-largest-health-programme.

২. https://thewire.in/221472/health-insurance-budget-2018-nhps.

৩. https://thewire.in/221095/calling-modicare-accountability-also-taken-modi/ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

বই পড়া

স্বাস্থ্য (অ) ব্যবস্থা

প্রকাশক গুরুচণ্ডা৯, পৃষ্ঠা ১৬২, মূল্য ১২০ টাকা

ডা. বিষাণ বসু

বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা চিকিৎসার উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একগুচ্ছ নিবন্ধের সংকলন *স্বাস্থ্য (অ) ব্যবস্থা* নিয়ে আলোচনা করতে বসে, হয়তো অপ্রাসঙ্গিকভাবেই, মনে পড়ে গেল সেই আশ্চর্য প্রবন্ধের কথা—*On Bullshit*, লেখক Harry G. Frankfurt।

বুলশিটের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ হয় কিনা জানা নেই। ভাঁওতাবাজি কিংবা ঢপবাজি শব্দটি খুব কাছাকাছি হলেও যথার্থ প্রতিশব্দ হল না। অনুবাদের চেষ্টা ছেড়ে, মূল শব্দ অপরিবর্তিত রেখেই আসল কথায় আসি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট সাহেব বুলশিটকে মিথ্যার থেকে আলাদা করে বলেন, বুলশিট সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, এ হল, পুরোপুরি মিথ্যে না বলেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল, যাতে, সত্যিমিথ্যের ব্যাপারটাই গুলিয়ে দেওয়া যায়। সত্যবাদীর মতো, যিনি মিথ্যেবাদী, তিনিও সত্যিটা জানেন; কিন্তু, তাঁর উদ্দেশ্য, শ্রোতার কাছে সেই সত্যের গোপন। অর্থাৎ, সত্যভাষী-মিথ্যেবাদী দু-জনেই নিয়ম মেনে একই খেলা খেলছেন, শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ হিসেবে, দূরত্ব এটুকুই। দু-জনের কেউই কিন্তু সত্যের মান্যতা অস্বীকার করছেন না। ব্যাপারটা বদলে যায় বুলশিটের ক্ষেত্রে। সেখানে বক্তার একমাত্র লক্ষ্য হল নিজের উদ্দেশ্য বিষয়ে শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করা, সত্যি-মিথ্যের তোয়াক্কা না করেই। সত্যের প্রাধিকার বা এক্তিয়ারের লঙ্ঘন এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী।

চারপাশেই বুলশিটের ছড়াছড়ি। যেমন, চায়ের দোকানে রাজাউজির মারা, যেটা অবশ্য আজকাল সন্ধ্যেবেলায় টেলিভিশনের পর্দায় উঠে এসেছে। এখানে বক্তার উদ্দেশ্য, নিজেকে জ্ঞানী, সচেতন কিংবা চিন্তাশীল প্রমাণ করা, যদিও অনেকসময়েই, মূল বিষয়টি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা থাকে নামমাত্র; কিন্তু, জ্ঞানের অভাব মতপ্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

সমস্যা হয় তখনই, যখন বুলশিট সরকারি সামাজিক পরিসরটি দখল করে বসে, বা যখন বুলশিট প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিতে থাকে। সহজলভ্য সত্যও তখন সাধারণ নাগরিকের নজর এড়িয়ে যায়, কেননা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই, সত্যের মান্যতার তোয়াক্কা করা হয় না। সহজ-দৃশ্যমান বাস্তব, এমনকী চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও, বিশ্বাসযোগ্য হয় না। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজটি নেহাত রুটিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণ হিসেবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রটিকে বাছা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যস্তরে, বুলশিটেরই দাপাদাপি। কেউ যদি গণেশকে বৈদিকযুগে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চান, তো অপরপক্ষ ঝাঁ-চকচকে বাড়ি খাড়া করেই প্রমাণ করে ফেলেন যে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে সুপারস্পেশালিটি পরিষেবা পৌঁছে গেছে। সর্বগ্রাসী বুলশিটের দাপটে হারিয়ে যায় সহজ সত্যিগুলো। যেমন, বাজেট ছাঁটতে ছাঁটতে অধুনাবিস্মৃত জনস্বাস্থ্য, বেহাল সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চূড়ান্ত অগোছালো প্রাথমিক স্বাস্থ্য। জনস্বাস্থ্যে অবহেলায় সাধারণ মশকবাহিত অসুখ মহামারির আকার নিলেও চোখ বন্ধ করা যায় অনায়াসেই।

অন্যদিকে, সলমা-জরি বোনার নিপুণ দক্ষতায় নির্মিত হয় আরেক কাহিনি। মধ্যবিত্ত, এমনকী নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষও ধরে নেন বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রই একমাত্র ভরসা। সরকারি হাসপাতালে সাধারণ পরীক্ষানিরীক্ষায় জাঁকিয়ে বসে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ। এমনকী, সরকার যখন ঠিক করেন যে স্বল্পমূল্যে ওষুধ বিক্রির ব্যবস্থা করবেন, তখন, তার লাভও পেতে থাকেন বৃহৎ ওষুধ-বিক্রয়কারী সংস্থাগুলিই। ক্রমাগত বুলশিটের ঠেলায়, প্রায় অলৌকিকভাবে,

সাধারণের চোখের সামনে ঘটলেও কেউ দেখতে পান না কিছুই; প্রতিবাদ, অতএব, দুরাশামাত্র।

এরই মাঝে, ঢালাও লাভের সুযোগ পেয়ে, বেসরকারি মুনাফার লোভ হয়ে ওঠে সীমাহীন। প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার নামে, বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি আমদানি করতে থাকেন উত্তরোত্তর বহুমূল্য চিকিৎসা। তাঁদের বিজ্ঞাপন, যা কিনা সেমিনার বা ওয়ার্কশপের মোড়কে ডাক্তারবাবুদের আপডেটেড থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, সেও আরেক বুলশিট—অর্থাৎ সম্পূর্ণ মিথ্যে না হয়েও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। সবমিলিয়ে, চিকিৎসার ব্যয় হয়ে ওঠে লাগামহীন। চিকিৎসার খরচ জোগাতে সর্বস্বান্ত হন সাধারণ মানুষ, কিন্তু বিনিয়োগকারীর লাভের ঝুলি উপচে পড়ে। সাধারণ নাগরিকের মনে, ধীরে হলেও, ক্ষোভ দানা বাঁধে।

পথে নামেন বুলশিটের দক্ষ কারবারিরা। রাজ্যে রাজ্যে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের নামে তৈরি হয় নিত্যনতুন আইন। প্রকাশ্যত, উদ্দেশ্য মহৎ—সাধারণের চিকিৎসাব্যয়ের লাঘব, মুনাফায় লাগাম। নাগরিক বিভ্রান্ত হন অনায়াসেই; দেখতেও পান না, বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় লাগাম যাঁরা টানছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের হাতে থাকা

বাজেট ছাঁটতে ছাঁটতে অধুনাবিস্মৃত জনস্বাস্থ্য, বেহাল সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চূড়ান্ত অগোছালো প্রাথমিক স্বাস্থ্য।

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিষয়ে প্রায় নীরব। বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের এই প্রয়াস, কার্যত, পর্যবসিত হয় ভরা বর্ষায় গাছের ডালপালা ছাঁটায়—তাদের বাড়বাড়ন্ত হয় আরও সতেজ, কেননা, মানুষের সামনে প্রাথমিক বিকল্পটি পরিকল্পিতভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। লাগাতার বুলশিটের চোটে মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে যান, সরকারেরই তো দায়িত্ব ছিল সবার নাগালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, তাহলে তাঁরা নিজের ছেলেটিকে, থুড়ি, সরকারি হাসপাতালগুলিকে, উচ্ছন্নে যেতে দিয়ে বাকি পাড়ার অভিভাবকত্বে ব্যস্ত হলেন কেন!

ব্যক্তি চিকিৎসকের সংকট আরেক ধরনের। বেসরকারি মুনাফা অর্জনের মুখ হিসেবে ব্যবহৃত হন তিনি, কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাধীনতা সীমিত। প্রমাণ-নির্ভর চিকিৎসার নামে চিকিৎসা অনাবশ্যক ব্যয়বহুল জেনেও তিনি গণ্ডি পেরোতে পারেন না, কেননা, বেগতিকে চিকিৎসার বিচার হবে আদালতে, সেখানে তিনি প্রমাণ করে উঠতে পারবেন না কেন তিনি "সর্বাধুনিক" "শ্রেষ্ঠ" চিকিৎসাটি করেননি। বেসরকারি কাঠামোয় খরচের ব্যাপারে চিকিৎসকের অবদান সামান্য, কিন্তু খরচের মুখ তিনিই, পরিজনের আক্রোশের শিকার, অনিবার্যভাবেই তিনি। রোগী, আইনানুসারে, ক্রেতা; অঙ্কের নিয়মেই, ডাক্তারবাবু বিক্রেতা। ব্যাবসার লক্ষ্য ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করা। কাজেই, চিকিৎসা হবে রোগীর পছন্দমাফিক। অন্তত, ব্যাবসার মুখোশটি হবে এমন করে সাজানো, যাতে ক্রেতা বিশ্বাস করতে পারবেন, এই বিপুল আয়োজন তাঁকে খুশি করার জন্যেই—সেখানে, কর্মচারীরূপ ডাক্তারবাবুকে আলাদা করে সম্মানের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে! কিন্তু, চিকিৎসক তাঁর আজন্মলালিত সংস্কৃতিতে জেনেছেন, উত্তম বৈদ্য তিনিই, যিনি প্রয়োজনবোধে রোগীকে জোর করেও ওষুধ খাইয়ে দেবেন। এই দ্বন্দ্ব তিনি কাটাবেন কোন পথে? অধিকাংশই, জেনেবুঝে বা অজান্তে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন, কিন্তু, অনুভূতিশীল চিকিৎসকের সামনে সত্যি, মিথ্যে, বুলশিট, বাস্তব সবই গুলিয়ে যায়।

মিথ্যের মোকাবিলা সহজতর, কেননা, তার বিপরীতে সত্যিটা তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু, বুলশিটের উত্তর জটিল, কেননা শুধুমাত্র সত্যিটা জানালেই মানুষের বিভ্রান্তি কাটে না, বিশেষত যেখানে ভ্রমের উৎস সযত্নলালিত, পরিকল্পিত। তাহলে, পথ কী?

ডা. পুণ্যব্রত গুণের সম্পাদনায় প্রকাশিত ছোট্ট বইটি, *স্বাস্থ্য (অ) ব্যবস্থা*, সত্যিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। উত্তরাধুনিক বিশ্বে, শাশ্বত নিরপেক্ষ সত্যির জায়গাটা প্রায় নেই। কাজেই, বইয়ের সত্যিটা আপাতদৃষ্টিতে চিকিৎসকের সত্য; কিন্তু, এই সত্য রোগীদেরও সত্য। সর্বপ্লাবী বুলশিটের বাজারে অবিশ্বাস্য শোনালেও, সরল সত্যিটা হল, বেসরকারি মুনাফার স্বাস্থ্যজগতে ডাক্তার এবং রোগী, দু-জনের স্বার্থ একইদিকে—অন্যপক্ষে আছেন বৃহৎ পুঁজি আর তার স্বার্থরক্ষাকারী সরকার। সহজ কথাটা তাড়াতাড়ি বুঝলে ডাক্তার-রোগী দুইয়েরই মঙ্গল।

চোদ্দটি ছোটোবড়ো প্রবন্ধ মিলে এই বই। প্রধানত চিকিৎসকেদেরই লেখা। অবসরপ্রাপ্ত আমলা দিলীপ ঘোষ জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা (নাকি, পরিকল্পনার অভাব?) নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন। সম্পাদক ডা. পুণ্যব্রত গুণের লেখা আছে দু-টি। পুণ্যব্রতবাবু, বাঙালিসুলভ মুখে রাজাউজির মারাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না—তাঁদের শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে গরিবমানুষের মধ্যে চিকিৎসা-পরিষেবা পৌঁছানোর জরুরি কাজটি করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। এমনকী, একটি চালু প্রেসক্রিপশনের ওষুধগুলি খেতে থাকা মানুষের মাসিক চিকিৎসার খরচ কীভাবে কমানো যায়, এই নিয়ে তাঁদের কাজকর্ম রীতিমতো বৈপ্লবিক। দুর্ভাগ্য আমাদের, এসব কথা মিডিয়ার নজরে আসে না, কাজেই আমরা খবর পাই না। রাজ্য সরকারের নয়া স্বাস্থ্যবিলের দিশাহীনতা নিয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধ, অন্যটি বর্তমান ব্যবস্থায় জেনেরিক ওষুধের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে। দু-টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য অসামান্য প্রাবন্ধিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি তদ্‌সংক্রান্ত মানবিকীবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত *বায়োমেডিসিন থেকে নজরদারি মেডিসিন*

(প্রকাশক: হাওয়াকল) চিকিৎসার দর্শন এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বাংলাভাষায় লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বই বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর প্রবন্ধটি চমৎকার। স্বল্পপরিসরে, নয়া স্বাস্থ্যবিল প্রসঙ্গে তিনি আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণ করেছেন, উদার অর্থনীতিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অনিবার্য সংকটটিও বুঝিয়েছেন বেশ। স্বাস্থ্যবিল নিয়ে অপর তথ্যঋদ্ধ লেখাটি ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্তর।

ক্যান্সার চিকিৎসার লাগামছাড়া খরচের চোটে রোগীপরিজন সর্বস্বান্ত হন, চিকিৎসার ফল মোটেই ব্যয়ের সমানানুপাতে বাড়ে

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে গরিবমানুষের মধ্যে চিকিৎসা-পরিষেবা পৌঁছানোর জরুরি কাজটি করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। . . . তাঁদের কাজকর্ম রীতিমতো বৈপ্লবিক।

না—যদিও, বাড়তেই থাকে কোম্পানির মুনাফা। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে অসাধারণ লিখেছেন ডা. স্থবির দাশগুপ্ত।

সুলিখিত প্রবন্ধে ডা. কৌশিক দত্ত ধরেছেন বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রোগীপরিজনেদের অসন্তোষের কারণগুলি, বিশ্লেষণ করেছেন ক্ষোভের অভিমুখটি কেন দিকভ্রান্ত, দিকনির্দেশ করেছেন মূল সমস্যার। একই বিষয়ে চমৎকার লিখেছেন ডা. অমিতাভ চক্রবর্তীও। চলতি ব্যবস্থায় চিকিৎসকের অসহায়তার মানবিক চিত্র এঁকেছেন ডা. ইন্দ্রনীল ঘোষদস্তিদার।

যেখানে শহরের চারপাশ ছেয়ে যায় সস্তায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির বিজ্ঞাপনে, সেখানে, ডা. গৌতম মিস্ত্রী আর প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দু-টি চোখ খুলে দেয়। ডা. ঈপ্সিতা পালভৌমিক লিখেছেন জনস্বাস্থ্যের বেহাল দশা নিয়ে। একটু অগোছালোভাবে হলেও, প্রবাসী ডাক্তারবাবু অরিন্দম বসু লিখেছেন চিকিৎসার মানবিক মুখের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

সবশেষের প্রবন্ধটি, চিকিৎসকদের নতুন সংগঠন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের তরফে। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁদের বিশ্বাস, রোগী এবং ডাক্তারদের স্বার্থ অভিন্ন। বেশ কথা। কিন্তু, সংগঠনের অন্যতম প্রাণপুরুষ, ডা. রেজাউল করিম, বর্তমান সংকলনেই, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, চিকিৎসায় ভুল/গাফিলতি নিয়ে আলোচনার একমাত্র উপযুক্ত স্থান মেডিক্যাল জার্নাল। সেই জার্নাল তো সাধারণের নাগালের বাইরে। কারও কথা শুনতে গেলে তো তার পাশে, তার সামনে বসেই শুনতে হবে, যেমনটি উবু হয়ে বসে শুনেছিলেন যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী মানুষটি। অনেক কথার শেষেও, সেই উদ্যোগ কোথায়? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে রেডিয়োথেরাপি বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

এই লেখাটি কিছুটা পরিবর্তিতভাবে *এই সময়* পত্রিকায় ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ প্রকাশিত হয়েছে।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।